বেতারবাংলা

বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ ১৪৩০

২৬ মার্চ ২০২৩ তারিখে রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ এবং প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বঙ্গভবনে মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবসের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে কেক কাটেন। এসময় ফার্স্ট লেডি রাশিদা খানম, নবনির্বাচিত রাষ্ট্রপতি মোঃ সাহাবুদ্দিন ও তাঁর সহধর্মিণী ড. রেবেকা সুলতানা উপস্থিত ছিলেন

২৪ এপ্রিল ২০২৩ তারিখে বঙ্গভবনের দরবার হলে মোঃ সাহাবুদ্দিনকে ২২তম রাষ্ট্রপতি হিসেবে শপথবাক্য পাঠ করান স্পিকার ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী। এসময় বিদায়ি রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ উপস্থিত ছিলেন

২৬ এপ্রিল ২০২৩ তারিখে রাষ্ট্রপতি মোঃ সাহাবুদ্দিন টুঙ্গিপাড়ায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সমাধিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন

বেতারবাংলা

দ্বি-মাসিক পত্রিকা

বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ ১৪৩০ ● ১৪ এপ্রিল ২০২৩ - ১৪ জুন ২০২৩

সম্পাদকীয়

পহেলা বৈশাখ বাঙালির প্রাণের উৎসব, পহেলা বৈশাখ মানেই 'এসো হে বৈশাখ, এসো এসো'। চিরচেনা সেই সুমধুর গান দিয়ে প্রতিবছর ঘুরে আসে বাংলা সনের প্রথম দিন পহেলা বৈশাখ। এইদিনে রাজধানী ঢাকার রমনার বটমূলে সাংস্কৃতিক সংগঠন ছায়ানটের সংগীতানুষ্ঠানের মাধ্যমে নতুন বছরকে বরণ করে নেয়া হয়। ঢাকার বৈশাখি উৎসবের আরেকটি আবশ্যিক অঙ্গ হলো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা ইনস্টিটিউটের উদ্যোগে মঙ্গল শোভাযাত্রা। এই শোভাযাত্রায় গ্রামীণ জীবন এবং আবহমান বাংলাকে ফুটিয়ে তোলা হয়। নববর্ষ বিদায়ী বছরের গ্লানি মুছে দিয়ে বাঙালি জীবনে ওড়ায় নতুনের কেতন, চেতনায় বাজায় মহামিলনের সুর। সব ভেদাভেদ ভুলে সব বাঙালিকে দাঁড় করায় এক সম্প্রীতির মোহনায়। সবার নতুন বছর খুব ভালো কাটুক- এই আশা করি। সকলকে নববর্ষের শুভেচ্ছা।

২৫শে বৈশাখ বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১৬২তম জন্মবার্ষিকী। কলকাতার জোড়াসাঁকোর বিখ্যাত ঠাকুর পরিবারে ১২৬৮ বঙ্গাব্দের ২৫শে বৈশাখ তিনি জন্মগ্রহণ করেন। ১৬২ বছর পেরিয়ে গেল তাঁর জন্মের, লোকান্তরিত হয়েছেন তা-ও বহু বছর হতে চলল; কিন্তু বাঙালির জীবন ও মানসে তাঁর উপস্থিতি প্রতি মুহূর্তে এতই দেদীপ্যমান যে মনেই হয় না তিনি নেই। তাঁর জন্মদিন বাঙালির কাছে পরিণত হয়েছে আনন্দ উৎসবের দিনে।

কাজী নজরুল ইসলাম, বাংলা সাহিত্যাকাশে যার আবির্ভাবকে বলা যায় অগ্নিবীণা হাতে ধূমকেতুর মতো প্রকাশ। তিনি নিজেই নিজেকে বলেছেন, 'বিশ্ব ছাড়ায়ে উঠিয়াছি একা চির-উন্নত শির'। তাই তাঁর উপাধি বিদ্রোহী কবি। অন্যায়ের বিরুদ্ধে দ্রোহের আগুন জ্বালিয়েছেন ঠিকই কিন্তু প্রেমময় নজরুলও হিমালয়সম শুভ্র। ১১ই জ্যৈষ্ঠ সেই দ্রোহ ও প্রেমের কবি, বাংলাদেশের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের ১২৪তম জন্মবার্ষিকী। তিনি বাংলা সাহিত্যের গতিপথ পাল্টে বিদ্রোহ-প্রতিবাদ-প্রতিরোধের ধারা তৈরি করেন। উন্নত কণ্ঠে উচ্চারণ করেন সাম্য আর মানবতা। ধ্যান-জ্ঞান, নিঃশ্বাস-বিশ্বাস, চিন্তা-চেতনায় তিনি সম্প্রীতি ও অসাম্প্রদায়িকতার কবি ছিলেন।

পূর্ণ একমাস সিয়াম সাধনার পর ঈদ উৎসব মুসলিম জাতির প্রতি সত্যিই মহান রাব্বুল আলামিনের পক্ষ থেকে এক বিরাট নিয়ামত ও পুরস্কার। ঈদ মুসলমানদের জীবনে শুধুমাত্র আনন্দ-উৎসবই নয়, বরং এটি একটি মহান ইবাদাত যার মাধ্যমে মুসলিম উম্মাহ ঐক্যবদ্ধ হওয়ার প্রেরণা খুঁজে পায়, ধনী-গরিব, কালো-সাদা, ছোট-বড়, দেশি-বিদেশি সকল ভেদাভেদ ভুলে যায়। ঈদের আনন্দঘন মুহূর্তে সবার মাঝে ভ্রাতৃত্ব বন্ধন দৃঢ় হোক। পবিত্র ঈদ-উল-ফিতর উপলক্ষ্যে বেতার বাংলার সকল পাঠক, লেখক, গ্রাহক ও শুভানুধ্যায়ীদের জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা।

আঞ্চলিক পরিচালক
মর্জিনা বেগম

সম্পাদক
মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন

বিজনেস ম্যানেজার
মোঃ শরিফুর রহমান

সহ সম্পাদক
সৈয়দ মারুফ ইলাহি

প্রচ্ছদ
জামান পুলক

আলোকচিত্র
বেতার প্রকাশনা দপ্তর, পিআইডি,
বাংলাদেশ বেতারের কেন্দ্র ও ইউনিটসমূহ

মুদ্রণ সংশোধক
মো: হাসান সরদার

প্রকাশক
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ বেতার

বেতার প্রকাশনা দপ্তর
জাতীয় বেতার প্রশাসন ভবন
৩১, সৈয়দ মাহবুব মোর্শেদ সরণি
শের-ই-বাংলা নগর, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭
ফোন:০২-৪৪৮১৩০৩৯ (আঞ্চলিক পরিচালক)
০২-৪৪৮১৩০৫৩ (সম্পাদক)
০২-৪৪৮১৩০০৯ (বিজনেস ম্যানেজার/ফ্যাক্স)
ওয়েবসাইট: www.betar.gov.bd
ইমেইল: betarbanglabd@gmail.com
ফেসবুক: /betarbangla.bb

নামলিপি
কাইয়ুম চৌধুরী

মূল্য
প্রতি সংখ্যা: ২০ টাকা
ডাকমাশুলসহ প্রতি সংখ্যা: ৩০ টাকা

প্রোডাকশন
দশদিশা প্রিন্টার্স

সূচিপত্র

প্রবন্ধ-নিবন্ধ

৩

গতিময় বাংলাদেশ সামনের দিকেই হাঁটছে
ড. আতিউর রহমান ৪

আবহমান বাংলার বর্ষশুরু উৎসব
ড. সাইফুদ্দীন চৌধুরী ৮

মুজিবনগর সরকারের নেতৃবৃন্দের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি
মোহাম্মদ শাহজাহান ১০

ইদের নামাজ ইদের শিক্ষা
মাওলানা মুফতী মোঃ ওমর ফারুক ১৪

রবীন্দ্রনাথ : পারিবারিক ইতিহাস ও ঐতিহ্য
ইকবাল খোরশেদ ২৪

নজরুলের ধর্মীয় সম্প্রীতির চেতনা
ড. মিল্টন বিশ্বাস ২৮

গণসম্প্রচারের ইতিবৃত্ত (১৯২২ থেকে ১৯৯২ খ্রিস্টাব্দ): বাংলাদেশ প্রেক্ষিত (২য় পর্ব)
দেওয়ান মোহাম্মদ আহসান হাবীব ৩১

প্রবাল দ্বীপের হাতছানি
সৈয়দা তাসলিমা আক্তার ৩৫

গল্প

বৈশাখী গান
সেলিনা হোসেন ১৮

বাংলাদেশ বেতার থেকে সরাসরি সম্প্রচারিত অনুষ্ঠানের সচিত্র প্রতিবেদন ১৬৫

বেতার সংবাদ ১৭৪

বেতার আলবাম ১৭৭

১৭৯

কবিতা

বঙ্গবন্ধু: নতুন পাতায় আলোর শব্দ
সোহরাব পাশা ৭

হৃদয়ে নজরুল
পারভেজ বাবুল ৭

আমি এক জীবন্ত নুড়ি
মমতা মজুমদার ১৩

বিয়োগান্ত অধ্যায়
ফারজানা ইয়াসমিন ১৩

আমাকে চলে যেতে হবে
মিয়া সালাহউদ্দিন ১৩

নামলিপি
মুহাম্মদ ফরিদ হাসান ১৩

ইদ মানে
গোলাম নবী পান্না ১৭

মঙ্গলের আহ্বানে বৈশাখ
এস এম তিতুমীর ১৭

আলোর মিছিল
নাসরীন খান ১৭

বৈশাখে তাপদাহ
শাহান আরা জাকির ১৭

নামটি তোমার বোশেখ
কল্পনা সরকার ২৩

স্মৃতিপটে বৈশাখ
রফিকুল ইসলাম ২৩

তরুপল্লব

এবার ইদে
মির্জা রিজওয়ান আলম ৩৯

আকাশ ডাকে পাহাড়টাকে
সোমা মুৎসুদ্দী ৪১

ছবি আঁকা
সব্যসাচী নজরুল ৪১

শৈশব
মো. তাইফুর রহমান ৪১

মায়ের কাছে
কৃষ্ণ কর্মকার কৌশিক ৪১

আমগাছ আর ফইচ্চুন্নি ভূত
জুয়েল আশরাফ ৪২

বেতার পর্ব

গ্রীষ্মকালীন নির্দিষ্ট অনুষ্ঠান সূচি ৪৫

বাংলা নববর্ষ উপলক্ষ্যে বিশেষ অনুষ্ঠান পরিকল্পনা ১১৪

পবিত্র ইদ-উল ফিতর উপলক্ষ্যে বিশেষ অনুষ্ঠান পরিকল্পনা ১২৬

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে বিশেষ অনুষ্ঠান পরিকল্পনা ১৩৭

জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে বিশেষ অনুষ্ঠান পরিকল্পনা ১৪৬

বাংলাদেশ বেতারের জাতীয় ও স্থানীয় সংবাদ ১৫৮

বাংলাদেশ বেতার হতে প্রচারিত অনুষ্ঠানের দৈনিক সময়সূচি ১৫৯

বাংলাদেশ বেতারের এফএম ট্রান্সমিটারসমূহ ১৬২

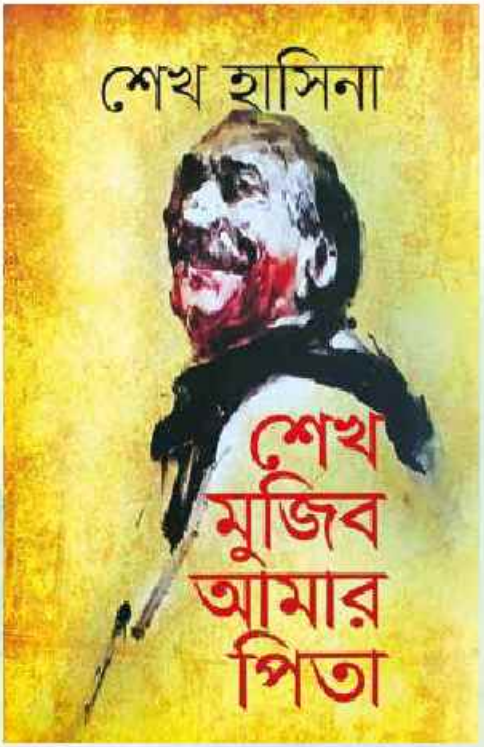

অনেক স্মৃতিভরা ধানমন্ডি ৩২ নং সড়কের বাড়ির জীবনে যেন চলে যাই। সেই আগের মতো সবাই আছে। একসঙ্গে হাসছি, কথা বলছি, কখনও রাগ করছি, ভাইবোনে খুনসুটি করছি। কখনও মিছিল আসছে। কত স্মৃতি। স্মৃতি বড় মধুর। আবার স্মৃতি অনেক বেদনার, যন্ত্রণার! ঘুম ভেঙে বাস্তবজগতে এলেই সেই যন্ত্রণা কুরে কুরে খায়। যত দিন বেঁচে রব এ যন্ত্রণা নিয়েই বাঁচতে হবে।

ধানমন্ডির ৩২ নং বাড়ি। আগামী ১৪ আগস্ট বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্মৃতি মিউজিয়াম হিসেবে আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করা হবে। কাজ চলছে। মিউজিয়াম করতে গেলে অনেক পরিবর্তন করতে হয়। সে পরিবর্তন কমিটি করাচ্ছে। আমি প্রায়ই যাই দেখতে। দেয়ালগুলিতে যখন পেরেক ঠোকে, জিনিসপত্রগুলি যখন সরিয়ে ফেলে বুকে বড় বাজে, কষ্ট হয় দুঃখ হয়। মনে হয় ঐ পেরেক যেন আমার বুকের মধ্যে ঢুকছে। মাঝে মাঝেই যাচ্ছি, ঘুরে দেখে আসছি যতই কষ্ট হোক। এই কষ্টের মধ্যে ব্যথা-বেদনার মধ্যে একটা আনন্দ আছে। সে আনন্দ হল আমরা জনগণকে তাদের প্রিয় নেতার বাড়িটি দান করতে পারছি। জনগণের সম্পত্তি হবে ৩২ নম্বর সড়কের বাড়িটি। এটাই আমাদের বড় তৃপ্তি। আমরা তো চিরদিন থাকব না কিন্তু এই ঐতিহাসিক বাড়িটি জনগণের সম্পদ হিসেবে সব স্মৃতির ভার নিয়ে ইতিহাসের নীরব সাক্ষী হয়ে থাকবে। এখানেই আমাদের সান্ত্বনা। আমরা ১৯৬১ সালের ১ অক্টোবর এই বাড়িটিতে আসি। তারপর থেকে কত গুরুত্বপূর্ণ সভা এই বাড়িতে হয়েছে। এই ১৯৬১ সাল থেকে '৯১ সাল পর্যন্ত কত ঘটনা এই বাড়ি ঘিরে। মাঝখানে ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট থেকে ৮১ সালের ১১ জুন পর্যন্ত বন্ধ ছিল। আব্বা শাহাদাত বরণ করার পর ওরা বাড়িটি সিল করে দেয়। তারপর আর কেউ প্রবেশ করতে পারেনি।

মনে পড়ে ১৯৬২ সালে আইয়ুববিরোধী আন্দোলন শুরু হয়। মণি ভাই এই বাড়ি থেকে নির্দেশ নিয়ে যেতেন, পরামর্শ নিতেন। ১৯৬২ সালে আব্বা গ্রেফতার হন। তখনকার কথা মনে পড়ে খুব। আমি ও কামাল পেছনের শোবার ঘরে থাকি, মাঝখানে বাথরুম, তারপরই মার শোবার ঘর। তখনও বাড়িটি সম্পূর্ণ হয়নি। আমরা যখন এ বাড়িতে এসে উঠি তখন কেবল দুটো শোবার ঘর আর মাঝের বসার ঘরটা হয়েছে। ওর অর্ধেকটায় খোকা কাকা, ন্যো ভাই, মণি ভাইসহ অনেক আত্মীয়-স্বজন থাকত। মাঝখানে পশ্চিম দিকে ছোট্ট একটা বসার ঘর তখনও অসমাপ্ত। রাতে হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল, দেখি বাইরে টিপটিপ বৃষ্টি, তার মধ্যে পুলিশ। জানালার পাশে একজন দাঁড়িয়ে আর একজন অত্যন্ত সতর্কভাবে গুটি গুটি পা ফেলে এগিয়ে যাচ্ছে। আমি পর্দার পাশে, ঘর অন্ধকারই তাই আমাকে দেখতে পায়নি। তাড়াতাড়ি কামালের খাটের কাছে গেলাম। ওকে ধাক্কা দিয়ে ওঠাতে চেষ্টা করলাম। ও চোখ খুলল, 'হাসুপা কি?'

আমি বললাম, 'পুলিশ বাড়ি ঘিরে ফেলেছে'। একথা বলেই তাড়াতাড়ি বাথরুমের দরজার কাছে গিয়ে মাকে ডাকলাম। মা ও আব্বা যখন টের পেয়ে গেছেন। মা বললেন, 'তোমার আব্বাকে ওরা অ্যারেস্ট করবে।' ঐ বাড়ি থেকেই আব্বাকে বন্দি করে নিয়ে গেল। প্রায় পাঁচ ছয় মাস আব্বা জেলে থাকেন।

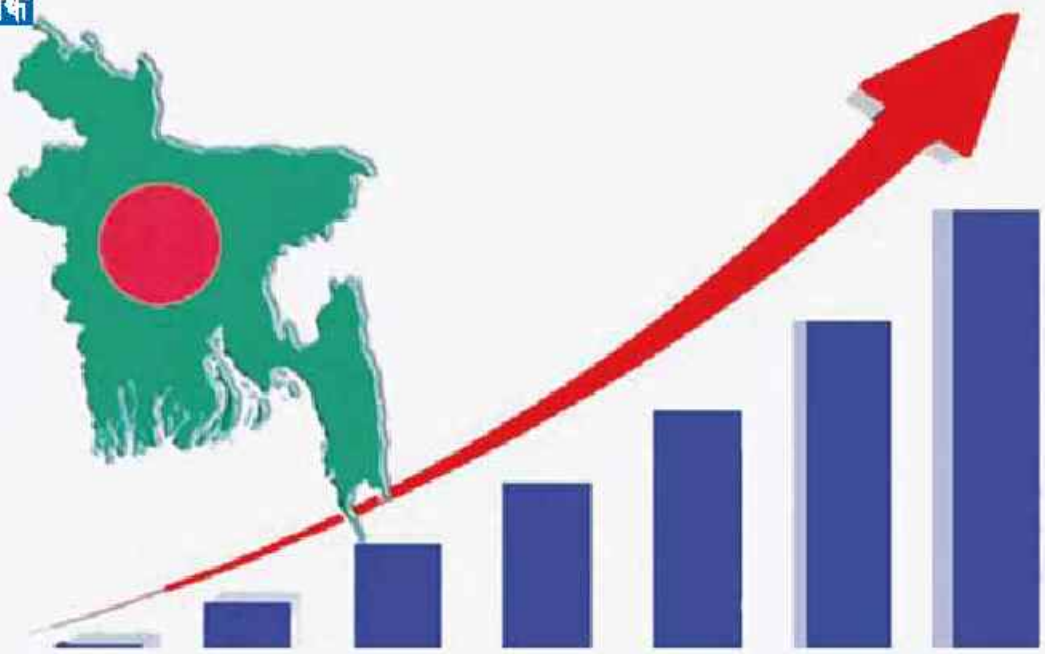

গতিময় বাংলাদেশ সামনের দিকেই হাঁটছে

ড. আতিউর রহমান

বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে সদ্য স্বাধীন যুদ্ধ-বিধ্বস্ত বাংলাদেশ তার উন্নয়ন অভিযাত্রা শুরু করেছিল ঠিক যেন গ্রামের সরু মেঠো পথ ধরে। অর্থনীতির আকার ছিল মাত্র ৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, মাথাপিছু আয়মাত্রা ৯৩ মার্কিন ডলার। সেই বাংলাদেশ বঙ্গবন্ধুর দেখানো পথে এগিয়েই আজ উঠে এসেছে অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের মহাসড়কে। অর্থনীতির আকার ৬৬০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, মাথাপিছু আয় ২,৮০০ মার্কিন ডলার। গত অর্থবছরে (২০২১-২২) গোটা বিশ্ব অর্থনীতি যখন ৩.৫ শতাংশ হারে সঙ্কুচিত হয়েছে, তখনও বাংলাদেশের প্রবৃদ্ধি হয়েছিল ৪ শতাংশের বেশি। ২০২২-২৩ অর্থবছরে প্রবৃদ্ধির হার ৭ শতাংশের বেশি হবে প্রক্ষেপণ করেছে স্ট্যানচার্টের গবেষক দল। সরকারের বাজেট ডক্যুমেন্টসও একই কথাই বলছে। আন্তর্জাতিক অর্থায়নকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রক্ষেপণ ও একই রকম আশাব্যঞ্জক। করোনা মহামারির ধাক্কার পরও এমন অর্জন এটাই প্রমাণ করে যে, বাংলাদেশ প্রকৃত অর্থেই ২০৪১ সালের মধ্যে উচ্চ আয়ের দেশের মর্যাদা অর্জন করতে যাচ্ছে। দুই অঙ্কের প্রবৃদ্ধি, ১২ হাজার ডলারের বেশি মাথাপিছু আয়, সঞ্চয়-জিডিপি'র অনুপাত ৩৭ শতাংশের বেশি হওয়া- এসব সামষ্টিক অর্থনৈতিক লক্ষ্য অর্জন যে আগামী দুই দশকে বাংলাদেশের পক্ষে অর্জন করা খুবই সম্ভব- তা বলছেন সব বিশ্লেষক ও বিশেষজ্ঞরাই।

বাংলাদেশের উন্নয়নের গল্পটি আসলেই চমকপ্রদ। মুক্তিযুদ্ধ-পরবর্তী ছাই-ভস্মের মধ্যে দাঁড়িয়ে একেবারে শূন্য থেকেই যাত্রা শুরু করেছিল বাংলাদেশ। বহুমাত্রিক প্রতিকূলতার মধ্যেও জাতিকে দিশা দিয়েছেন বঙ্গবন্ধু। চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে করেই কীভাবে এগিয়ে যাওয়া যায় সে উদাহরণ তিনি দেশবাসীর সামনে স্থাপন করে চলেছিলেন তাঁর স্বল্পকালীন শাসনামলে। তাঁর অসামান্য নেতৃত্বের গুণেই জোরকদমে হাঁটতে শুরু করেছিল বাংলাদেশ।

মাত্র চার বছরেরও কম সময়ে বহু বিশেষজ্ঞের ধারণাকে ভুল প্রমাণ করে বঙ্গবন্ধু তাঁর বাংলাদেশকে অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের 'এক্সপ্রেসওয়ে'তে তুলে দিয়েছিলেন। দ্রুত পুনর্বাসন শেষ করে তিনি দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগে বিশ্বাসী ছিলেন বলেই এই অল্প সময়ের মধ্যেই বাংলাদেশের মাথাপিছু আয় প্রায় তিনগুণ বেড়ে ২৭৩ মার্কিন ডলারে পৌঁছেছিল। ঐ অভিযাত্রায় ষড়যন্ত্রকারীদের কারণে যদি ছেদ না পড়তো, যদি ১৯৭৫-এর ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধুকে শারীরিকভাবে আমাদের কাছ থেকে ছিনিয়ে না নেয়া হতো তাহলে আজকে আমরা কোথায় থাকতাম তা ভাবতেই অবাক লাগে!

তবে বঙ্গবন্ধু আমাদের মননে ও চিন্তায় সবসময়ই ছিলেন, আছেন। তিনি যে এখনও আমাদের মূল চালিকাশক্তি। তাই ১৯৯৬-এ দেশ আবার সঠিক পথে ফেরে তাঁরই সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হাত ধরে। ২০০১-এ ষড়যন্ত্রকারীদের তৎপরতায় আবারও এ অভিযাত্রায় ছেদ পড়েছিল। কিন্তু জীবনবাজি রেখে সংগ্রাম করে করে ফের তিনি ক্ষমতায় ফিরে আসেন আজ থেকে ১২ বছর আগে। আর তারপর থেকে আমাদের উন্নয়ন অভিযাত্রার গতি যেন কল্পনাকেও হার মানিয়েছে!

সামষ্টিক-অর্থনৈতিক এবং সামাজিক সকল সূচকে আমরা যেমন অভাবনীয় গতিতে এগিয়ে গিয়ে সকলের জন্য উদাহরণ সৃষ্টি করেছি, তেমনি শক্তিশালী সামষ্টিক-অর্থনৈতিক ভিত্তির জোরে বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দা ও করোনা মহামারি মোকাবেলার ক্ষেত্রেও নিজেদের সক্ষমতার প্রমাণ রেখে চলেছি। এখন আমরা অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধারে আমাদের সেই শক্তিমত্তার সদ্ব্যবহার করছি।

বঙ্গবন্ধু যে অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের অভিযাত্রা শুরু করেছিলেন এবং তাঁর সুযোগ্য কন্যা সে ধারাকে আরও বেগবান করেছেন- সেটির সামষ্টিক-অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রভাবগুলো অনুধাবনের বিষয়- অনুভবের বিষয়। ১৯৭৫-এর পর থেকে এখন পর্যন্ত বাংলাদেশের মাথাপিছু জিডিপি সাতগুণেরও বেশি বেড়ে ২০২০ সালে দাঁড়িয়েছিল ১,৬৬,৮৮৮ টাকার। ১৯৯০-পরবর্তীকালে মাথাপিছু আয় আগের চেয়ে তুলনামূলক দ্রুত বেড়েছে ঠিকই, তবে বিশেষ করে বিগত ১২-১৪ বছরে এক্ষেত্রে নাটকীয় গতি এসেছে। লক্ষ্য করার বিষয় ১৯৭৫ থেকে এখন পর্যন্ত মাথাপিছু আয়ে যে বৃদ্ধি হয়েছে তার ৭৩ শতাংশই হয়েছে গত এক দশকে। আর মূলত ভোগ থেকেই এসেছে এই প্রবৃদ্ধি। সেকারণেই বাংলাদেশের উন্নয়ন এতোটা অংশগ্রহণমূলক। কৃষির উন্নয়ন এখানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

এ শতাব্দীর শুরু থেকেই বাংলাদেশের জিডিপিতে কৃষিখাতের অবদান কমতে কমতে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ১৩.৭ শতাংশে নেমে আসে। আর সেই ফাঁকা স্থান প্রধানত পূরণ করেছে শিল্পখাত। শিল্পখাতের প্রসার মানেই আনুষ্ঠানিক কর্মসংস্থানের প্রসার। তবে উল্লেখ্য যে, জিডিপিতে কৃষির শতকরা অবদান কমে আসলেও কৃষি উৎপাদন কিন্তু বেড়েছে। তার মানে কৃষিতে আধুনিকায়ন ঘটেছে- উৎপাদনশীলতা বেড়েছে। পাশাপাশি গ্রামীণ আয়ের ৬০ ভাগই এখন আসছে অকৃষিখাত থেকে। অর্থাৎ আমাদের অর্থনীতি প্রকৃত অর্থেই বহুমুখী ও 'ডাইভার্স্ট' হয়ে উঠেছে।

তবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হলো বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অগ্রযাত্রার সুফল সামাজিক পিরামিডের একেবারে পাটাতনে থাকা সবচেয়ে পিছিয়ে থাকা নাগরিকদের কাছে পৌঁছে দেয়ার ক্ষেত্রে সাফল্য। এ শতাব্দীর শুরুতে বাংলাদেশে দারিদ্র্য হার ছিল প্রায় ৪৯ শতাংশ এবং অতিদারিদ্র্য হার ছিল ৩৪ শতাংশ। অর্থনৈতিক উন্নয়ন যথেষ্ট অন্তর্ভুক্তিমূলক রাখা গেছে বলেই দুই দশকের মধ্যে দারিদ্র্য হার অর্ধেকেরও বেশি কমিয়ে ২২ শতাংশে এবং অতিদারিদ্র্য হার দুই-তৃতীয়াংশেরও বেশি কমিয়ে ১১ শতাংশে আনা সম্ভব হয়েছে। তবে মহামারিজনিত অচলাবস্থার ফলে এ দুটি হার বেড়েছিল। তবুও মহামারির আগে এ হারগুলো কমিয়ে আনার কৃতিত্ব সুবিচেনাপ্রসূত সামষ্টিক অর্থনৈতিক নীতিকেই দিতে হবে। অর্থনীতি দ্রুত ঘুরে দাঁড়াচ্ছে বলে দারিদ্র্য নিরসনে ফের আমাদের সাফল্য আসতে শুরু করেছে। কভিড-উত্তর বাংলাদেশে দারিদ্র্য হার আবারও কমতে শুরু করেছে। বিশেষ করে গ্রামীণ অর্থনীতি চাঙ্গা হওয়ায় গ্রামীণ দারিদ্র্যের হার বেশি কমেছে। এখনও কমছে।

বাংলাদেশের সামষ্টিক অর্থনৈতিক অর্জন ও সম্ভাবনাগুলোকে বিবেচনায় নিয়েই কর্নেল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এবং বিশ্ব ব্যাংকের সাবেক প্রধান অর্থনীতিবিদ কৌশিক বসু বাংলাদেশের সাফল্যের তিনটি প্রধানতম কারণ চিহ্নিত করেছেন। প্রথমত, তাঁর মতে বাংলাদেশের সরকার জাতীয় অগ্রযাত্রায় দেশের বেসরকারি খাতের প্রতিষ্ঠানগুলোকে (অর্থাৎ এনজিওগুলোকে) কাজে লাগাতে সক্ষম হয়েছে, ফলে সামাজিক পরিবর্তনে তারা সরকারের পরিপূরক ভূমিকা রাখতে পেরেছে কার্যকরভাবে। দ্বিতীয়ত, বাংলাদেশে উন্নয়নমুখী কেন্দ্রীয় ব্যাংক বিগত এক দশকে আর্থিক অন্তর্ভুক্তির যে নীরব বিপ্লব ঘটিয়েছে সেটিও সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা অর্জনে বিশেষত অভ্যন্তরীণ চাহিদা বৃদ্ধিতে কার্যকর ভূমিকা রেখেছে বলে তিনি মনে করেন। তৃতীয়ত, কৌশিক বসু মনে করেন যে, বাংলাদেশের তুলনামূলক তরুণ জনশক্তি এবং সস্তা শ্রমের সহজলভ্যতা দেশের সামষ্টিক অর্থনৈতিক শক্তি বৃদ্ধির প্রধানতম নিয়ামক হিসেবে কাজ করেছে।

সব মিলিয়ে করোনাজনিত বৈশ্বিক আর্থিক মন্দা আসার আগের সময়টায় বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অবস্থার তুলনা চলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অব্যবহিত পরে ১৯৫০-এর দশকের সিঙ্গাপুর, জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া এবং তাইওয়ানের সাথে। ওই দেশগুলো সে সময় থেকে পরবর্তী ২৫ বছর ধরে ৭ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছে। তাদের প্রবৃদ্ধির ওই ধারাকেই 'এশিয়ান গ্রোথ মডেল' বলা হয়। বাংলাদেশও বর্তমানে ওই পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। কারণ বাংলাদেশও ওই দেশগুলোর মতোই অপেক্ষাকৃত কম দক্ষ জনশক্তির সমাবেশ ঘটিয়ে ব্যাপক রপ্তানি বৃদ্ধি নিশ্চিত করেছে, যুদ্ধ-পরবর্তী দুরবস্থা কাটিয়ে দ্রুত প্রবৃদ্ধি নিশ্চিত করেছে, এবং আরএমজি'র পাশাপাশি অন্য রপ্তানিপণ্য থেকেও বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের সম্ভাবনা তৈরি করতে সক্ষম হয়েছে। বিশেষত সুপরিকল্পিত বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল এবং আইসিটি পার্কগুলো বাংলাদেশের জন্য 'গেম চেঞ্জার' হয়ে উঠতে পারে।

একথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, স্বাধীনতার পরপর প্রায় শূন্য থেকে যাত্রা শুরু করতে হলেও এবং অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক বহুবিধ চ্যালেঞ্জ ও বৈরি প্রকৃতি মোকাবেলা করে হলেও বাংলাদেশ স্বাধীনতার পাঁচ দশকে অভাবনীয় অগ্রগতি অর্জন করেছে। একসময় যে দেশকে 'তলাবিহীন ঝুড়ি' বলা হতো সেই দেশ আজ অন্তর্ভুক্তিমূলক ও টেকসই উন্নয়নের রোলমডেল হিসেবে নিজেকে বিশ্বের সামনে হাজির করতে সক্ষম হয়েছে। স্বাধীনতার মহানায়ক বঙ্গবন্ধু ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ তাঁর ঐতিহাসিক ভাষণে বলেছিলেন- "দাবায়ে রাখতে পারবা না"। আসলেই বাংলাদেশকে 'দাবিয়ে রাখা' যায়নি। আর মাথানত না করে আত্মশক্তিতে বলিয়ান হয়ে এগিয়ে চলার এ প্রক্রিয়া শুরু করেছিলেন বঙ্গবন্ধু নিজেই। তিনি এদেশের মানুষের মধ্যে যে লড়াকু মনোবৃত্তির জাগরণ ঘটাতে সক্ষম হয়েছিলেন, তারই ধারাবাহিকতায় পরবর্তীতে বাংলাদেশের মানুষকে নেতৃত্ব দিয়ে চলেছেন বঙ্গবন্ধুকন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। চ্যালেঞ্জ শুরুতে ছিল, এখনও আছে। কিন্তু বাংলাদেশ সে সব চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করছে সাহসিকতার সাথেই। আর

তাই অগ্রগতি যেমন হয়েছে, তেমনি এর সুফলও পৌঁছে যেতে শুরু করেছে সকল স্তরের নাগরিকদের কাছে। পাশাপাশি সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচিসমূহ অনেকটাই কার্যকরী করা গেছে। ফলে প্রবৃদ্ধি যেমন হয়েছে, তেমনি অর্জনগুলোকে সুরক্ষা দেয়ার সক্ষমতা বা 'রেজিলিয়েন্স'ও তৈরি হয়েছে। বাংলাদেশ তার এই দুর্যোগ মোকাবেলার সক্ষমতার পরিচয় দিয়েছে সর্বশেষ এই করোনা মহামারিজনিত অর্থনৈতিক অচলাবস্থার মোকাবেলার ক্ষেত্রে। অর্থনীতিকে কিছুতেই থিমিয়ে পড়তে দেয়নি। তারল্য সংকটে পড়েনি বাংলাদেশ। এ ক্ষেত্রে উন্নয়নমুখী কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কৌশলগত ভূমিকার কথা স্বীকার করতেই হবে।

প্রায় পাঁচ দশক আগে বঙ্গবন্ধু যখন প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা জাতির সামনে হাজির করেছিলেন তখনও বাংলাদেশ বিপুল সংখ্যক চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি ছিল অভ্যন্তরীণ ও ভূ-রাজনৈতিক পরিস্থিতির কারণে। একই রকম সাহসিকতার পরিচয় দিয়ে ২০২১ সালে জাতির সামনে অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা হাজির করেছেন তাঁরই সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। এমন স্বাস্থ্যগত বিপর্যয় এবং মহামারিজনিত অর্থনৈতিক অচলাবস্থা থেকে পুনরুদ্ধার প্রক্রিয়াকে একটি সুদূরপ্রসারী নীতিকাঠামোর আওতায় আনার এই প্রচেষ্টা নিঃসন্দেহে সাহসী নেতৃত্বের প্রতিফলন।

অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মেয়াদকালে প্রায় ৬৫ লক্ষ কোটি টাকা বিনিয়োগ করে প্রায় সোয়া এক কোটি কর্মসংস্থান সৃষ্টির যে লক্ষ্য নেয়া হয়েছে সেটিকে বিদ্যমান বাস্তবতায় খুবই সময়োপযোগী বলে মনে হচ্ছে। পরিকল্পনা অনুসারে কর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে পারলে আয় বৈষম্যের চ্যালেঞ্জ কাটিয়ে ওঠা খুবই সম্ভব। কিন্তু যেহেতু এই পরিকল্পনার বিনিয়োগের ৮২ শতাংশই ব্যক্তিখাত থেকে আসবে তাই ব্যক্তিখাতের বিনিয়োগের গতি ও মান বাড়ানোর বিকল্প নেই। বাংলাদেশে বিনিয়োগ এখনও প্রধানত সরকারের ওপর নির্ভরশীল। তাই নীতি-নির্ধারকরা বিনিয়োগ পরিবেশ উন্নয়নের মাধ্যমে ব্যক্তিখাতের অংশগ্রহণ বাড়াতে বিশেষ মনোযোগ দিচ্ছেন। বিশেষ করে প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগের গতি বাড়ানোর জন্য আমাদের নিয়ন্ত্রণনীতি আরও স্মার্ট ও সহজ করার যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। সরকার এদিকটায় এখন নজর দিচ্ছে। অস্বীকার করা যাবে না যে আয়ের বৈষম্য বাড়ছে। তবে ভোগের বৈষম্য সেই তুলনায় অনেকটাই কম। মানুষ খেয়ে পরে মোটামুটিভাবে জীবন চালাতে পারছেন। কিন্তু অতিধনীদের হাতে প্রচুর অর্থ জমা হচ্ছে বলে আয়ের বৈষম্য কমানো বেশ চ্যালেঞ্জিং হয়ে গেছে।

আপামীর পথচলায় মানুষের ওপর বিনিয়োগ আরও বাড়াতে হবে। মহামারির কারণে স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও সামাজিক সুরক্ষা খাতের ঝুঁকি ও গুরুত্ব নতুন করে স্পষ্ট হয়েছে। জীবন-জীবিকার স্বার্থেই এসব খাতে আসন্ন বাজেট এবং পুরো অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সময় জুড়েই উল্লেখযোগ্য হারে সরকারি ও বেসরকারি বিনিয়োগ বাড়াতে হবে। গবেষণা ও প্রশিক্ষণ খাতেও সরকারি-বেসরকারি বিনিয়োগ বাড়াতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যান্য উচ্চশিক্ষা প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানকে অর্থনীতির চাহিদামতো প্রশিক্ষিত জনশক্তি উন্নয়নে এগিয়ে আসতে হবে। কৃষিই যে বাংলাদেশের রক্ষাকবচ তা এখন প্রমাণিত। তাই এখাতের আধুনিকায়ন, বহুমুখীকরণ, প্রক্রিয়াজাতকরণ, নিরাপদকরণ, বাজারজাতকরণ, সংরক্ষণ, রপ্তানিকরণ ও সবুজায়নের জন্য প্রয়োজনীয় নীতি-সমর্থন ও বাড়তি বিনিয়োগ অপরিহার্য। আরএমজি খাতের ওপর গুরুত্ব না কমিয়েও আইসিটিকে প্রবৃদ্ধির নয়াচালকের আসন করে দিতে হবে। এই সংকটকালে এখাত তার শক্তিমত্তা দেখিয়েছে। তাই সারাবিশ্বে বাংলাদেশের কম খরচের আইসিটি জ্ঞানভিত্তিক সলিউশন ছড়িয়ে দেবার এই সুযোগ হাতছাড়া করা যাবে না। প্রযুক্তি ও উদ্ভাবনকে সঙ্গী করেই বাংলাদেশের সরবরাহ চেইনকে স্থানীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে আরও দক্ষ করা সম্ভব। সেজন্য বাড়তি বিনিয়োগ ও প্রণোদনা দরকার। সেজন্য আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে নয়াঅংশীদারিত্ব ও কৌশলের সন্ধানও অপরিহার্য। অবকাঠামো বরাবরই প্রবৃদ্ধি-সহায়ক। রেল, শিপিং, বন্দর, বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল, দক্ষতা উন্নয়নের প্রতিষ্ঠান, নবায়নযোগ্য জ্বালানি উৎপাদন, এবং এসবের জন্য উপযুক্ত অর্থায়নের কাঠামো গড়ে তোলার জন্য সরকারি-বেসরকারি বিনিয়োগ বাড়াতে নীতি-অগ্রাধিকার প্রদান ও সেসবের দ্রুত বাস্তবায়ন খুবই জরুরি হয়ে পড়েছে। তবে এখনও আমাদের অর্থনীতি ও সমাজে নানামাত্রিক চ্যালেঞ্জ বিদ্যমান। বিশেষ করে দুর্নীতি, আমলাতান্ত্রিক জটিলতা এবং গুণমানের বাস্তবায়নের মতো প্রতিবন্ধকতা যে রয়েছে তা তো অস্বীকার করার উপায় নেই। এসব চ্যালেঞ্জ প্রতিরোধ করেই আমাদের ইতিবাচক পরিবর্তনকে ত্বরান্বিত করতে হবে। আর এখানেই সকল পর্যায়ে শক্তিশালী নেতৃত্ব এবং প্রশাসনে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার কোনো বিকল্প নেই।

বিগত ১২-১৪ বছরে বাংলাদেশের সামষ্টিক অর্থনৈতিক অগ্রযাত্রা এবং সার্বিক সামাজিক-মানবিক উন্নয়ন যে ব্যাপক গতিপ্রাপ্ত হয়েছিল করোনা মহামারির কারণে তাতে একটি ছেদ পড়েছে এতে কোনো সন্দেহ নেই। অধিকাংশ দেশের তুলনায় মহামারি মোকাবেলায় পারদর্শিতা দেখানো নিয়ে তাই খুব বেশি আত্মতুষ্টিতে ভোগার সুযোগ নেই। কারণ এখনও আমাদের সামনে রয়েছে আরও অনেক চ্যালেঞ্জ। তবে একথাও সত্য যে, বাংলাদেশের যে সম্ভাবনাগুলো মহামারির আগে ছিলো সেগুলো কিন্তু এখনও রয়ে গেছে। তাই অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধার প্রক্রিয়াতেও ওই সম্ভাবনাগুলোকে কাজে লাগিয়েই এগুতে হবে। এপ্রসঙ্গে প্রথমেই আসে বাংলাদেশের ভৌগলিক অবস্থানের সুবিধাকে কাজে লাগিয়ে আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক ভ্যালু/সাপ্লাই চেইনে দেশের অবস্থান আরও মজবুত ও ফলদায়ী করার কথা।

লেখক: বঙ্গবন্ধু চেয়ার অধ্যাপক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর

বঙ্গবন্ধু: নতুন পাতায় আলোর শব্দ

সোহরাব পাশা

ক্যালেন্ডারের রঙিন পাতায় হেসে ওঠো তুমি
তুমি হাসলেই হেসে ওঠে
মুগ্ধতামুখর এই বাংলাদেশ,

বহুদিন আগেই বিশ্ব জেনেছে-
বঙ্গবন্ধুর মৃত্যু নেই
'বিপন্ন বিষাদে'- অন্ধকারে অনির্বাণ-
দৃপ্ত আলো আর সাহসের নাম তুমি;

নতুন পাতার শব্দ-ঘ্রাণে
নুয়ে পড়ে তীব্র জ্যোৎস্নার বৃষ্টিতে ভেজা
তোমার চোখের স্নিগ্ধ হাসির শিশির
বড়ো অবাক সুন্দর প্রাণের স্বদেশ
এই বাংলাদেশ,

স্বরচিত আলো জ্বেলে হেঁটে গেছো তুমি- বড়ো একা
ক্লান্তিহীন দীর্ঘ পথে
তুমুল বেদনার কাছে নির্বাসিত ছিলো
তোমার সকল;

বিনয়ের দ্যুতিময় ভাষা ছিলো স্বপ্নময় চোখে
নতজানু ছিলে না কখনো মৃত্যুভয়ে
বঙ্গবন্ধু তুমি জেগে আছো প্রাণে প্রাণে
জেগে থাকবে চির অম্লান
স্বদেশের নিবিড় মুগ্ধ ভালোবাসায়।

হৃদয়ে নজরুল

পারভেজ বাবুল

(উৎসর্গ: প্রিয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম)

প্রিয় কবি, তুমি আমাদের হৃদয়ে
আমাদের শানিত চেতনায়
আমাদের সংগ্রামে, স্বাধীনতায়
আমাদের ভালোবাসায়।

প্রিয় কবি,
তুমি আমাদের অস্তিত্বে
আমাদের কবিতায়, সাহিত্যে
আমাদের বিরহ, মিলনে।

প্রিয় কবি,
তুমি শ্রেষ্ঠ প্রতিভার দ্যুতি
তুমি সাম্যের
তুমি কালোত্তীর্ণ, উত্তর আধুনিকতার
তুমি একজনই নজরুল আমাদের।

প্রিয় কবি,
তুমি ছন্দে আনন্দে অমর সৃষ্টির
পরতে পরতে সাজানো
ফুলেল সন্ধ্যা, সকাল দুপুর, স্নিগ্ধ রজনী
তুমি সূর্যোদয়ের লাল আভায় সুশোভিত
আপোষহীন, বিদ্রোহী,
পরাধীনতার প্রতিদ্বন্দ্বী।

প্রিয় কবি,
তুমি বাঙালির, গোটা বিশ্বের
তুমি কোটি মানুষের
আমাদের অহংবোধের সাহসী উচ্চারণে
তুমি আমাদের আত্মপরিচয়।

তোমাকে লাল সালাম, প্রিয় কবি নজরুল।

আবহমান বাংলার বর্ষশুরু উৎসব

ড. সাইফুদ্দীন চৌধুরী

ভূ-তাত্ত্বিক, নৃবিজ্ঞানী এবং প্রত্নবিদদের ব্যাখ্যার অনুবৃত্তিক্রমে একথা তো বলাই যায়, গাঙ্গেয় ব-দ্বীপাঞ্চলে সাত কি আট হাজার আগে যে কৃষিজীবী সভ্যতা গড়েছিল- ধানই ছিলো যে জনগোষ্ঠী জীবন রক্ষার প্রধান আহার্য। পাকা ধান ঘরে তোলার পর আনন্দে তারা মেতে উঠতো নিশ্চয়ই। তখনো তো থাকতো ফসলহীন শস্যক্ষেত, মেঘমুক্ত আকাশ, নিস্তরঙ্গ নদী-খাল-বিল। ঘরে কিছু খাবারের সঞ্চয় রয়েছে- এখনকার বর্ষবরণ উৎসবের মতো সেই আদি অধিবাসীরাও কী আজকের মতো কোন আনন্দে মেতে উঠতো?

প্রাচীন গাঙ্গেয় ব-দ্বীপ ভূখণ্ডে- একালের বাংলাদেশ, আসাম, ত্রিপুরা ও পশ্চিমবঙ্গে আজ বাংলা বর্ষবরণ উৎসব পালিত হচ্ছে। ইতিহাস থেকে জানা যায়, গৌড় রাজ শশাঙ্ক (৫৯০-৬২৫ খ্রিস্টাব্দ)'র শাসনামলে ৭৮ খ্রিস্টাব্দে ভারতের উজ্জয়িনী নগরের জ্যোতিষীরা শালিবাণ বা শাক্যকাল নামে এক সনের প্রচলন করেন, যা শকাব্দ হিসেবে শক রাজারা গুজরাট অঞ্চলে প্রবর্তন করেন। রাজা শশাঙ্ক ওই শকাব্দ অনুসরণ করে বঙ্গাব্দ বা বাংলা সনের প্রচলন করেন। তবে তিনি শকাব্দের চৈত্র মাসের পরিবর্তে বৈশাখ মাস থেকে বর্ষ গণনা সূচনা করেন। শকাব্দের মাসের নাম বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ় কিংবা দিনের নাম রবি, সোম, মঙ্গল ইত্যাদি অপরিবর্তিতই রাখেন। বর্তমান কালের গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ, পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, উড়িষ্যা এবং বিহার পর্যন্ত শশাঙ্কের সাম্রাজ্যে জুলিয়ান ক্যালেন্ডারের ১২ এপ্রিল ৫৯৪ খ্রিস্টাব্দ সোমবার এবং গ্রেগরিয়ান ক্যালেন্ডার অনুসারে ১৪ এপ্রিল ৫৯৪ খ্রিস্টাব্দ হতে শুরু হয় বাংলা নববর্ষ গণনা।

সিংহাসনে আরোহণের পর মোঘল সম্রাট আকবর দেখেন, তাঁর বিশাল সাম্রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে আলাদা আলাদা দিনপঞ্জি চালু রয়েছে, যার অধিকাংশই চান্দ্রবর্ষের হিসেবে

এবং হিজরি সালের সঙ্গে সামঞ্জস্যহীন। সঠিকভাবে দিন, তারিখ ও সময়ের হিসেব রাখায় বিপত্তির সৃষ্টি হচ্ছে। বার্ষিক খাজনা আদায়ের ক্ষেত্রেও হচ্ছে অসুবিধা। এজন্য সম্রাট আকবর তার প্রধান জ্যোতির্বিদ ফতুল্লাহ্ সিরাজীকে সঠিকভাবে একটি দিনপঞ্জি তৈরির নির্দেশ দেন। ফতুল্লাহ সিরাজী, রাজা শশাঙ্ক প্রণীত বঙ্গাব্দকেই দিনপঞ্জির জন্য অধিকতর নির্ভরযোগ্য মনে করেন। তবে ওই জ্যোতির্বিদ, একই সঙ্গে বার মাসের নামও রাখেন- কারওয়াদিন আরদি, বিহিসু, খোরদাদ, তীর, আমরদাদ, শাহ্‌রিয়ার, আবান, আজুর, দাই, বাহাম, ইস্কান্দার। বলাবাহুল্য, ফতুল্লাহ সিরাজীর বারমাসের নামগুলি পরবর্তীকালে জনগণের স্বীকৃতি পায়নি।

উপর্যুক্ত তথ্যাদি থেকে বিষয়টি অনেকটাই স্পষ্ট যে, খ্রিস্টীয় ৬ষ্ঠ শতক থেকে বাংলা বছর গণনার শুরু হয়েছিল, যার পুরোটাই ছিল চাষাবাদ বা কৃষির সঙ্গে সম্পর্কিত। একালে ওই বর্ষশুরুর বিষয়টি আনুষ্ঠানিকতা পেয়েছে, সার্বজনীনরূপ লাভ করেছে। নৃবিজ্ঞানী এবং প্রত্নবিদদের ধারণা, গাঙ্গেয় এই ব-দ্বীপাঞ্চলে মানববসতির অব্যবহিত পর যে কৃষিজীবী সভ্যতা গড়ে উঠেছিল, সেখানেও নতুন বছর শুরুর আনুষ্ঠানিকতা ছিল।

ভূ-তাত্ত্বিক ও নৃবিজ্ঞানীদের মতে, ৬০ কোটি বছর আগে অর্ক্যিয়ান যুগে গাঙ্গেয় ব-দ্বীপ অঞ্চলের সৃষ্টি হয়েছিল। ১.২ কোটি বছর পূর্বে প্লাইওসিন স্তরে এ অঞ্চল যে অন্তর্ভুক্ত ছিল, তার প্রমাণ মেলে প্রাক্ত নুড়িপাথর, বালু ও মধুপুর কাদামাটি থেকে। মধুপুর কাদামাটির বিস্তৃতি ছিল বর্তমান বাংলাদেশ, রাঢ়বঙ্গ এবং বিহারের ছোটনাগপুর মালভূমি অবধি।

তবে, গাঙ্গেয় ব-দ্বীপাঞ্চলে মানববসতির বয়স সাত থেকে আট হাজার বছরের বেশি নয়। নৃতাত্ত্বিক হার্বার্ট বিজলির মতে গাঙ্গেয় ব-দ্বীপ থেকে শুরু করে সিংহল পর্যন্ত অস্ট্রালয়েড নামক জনগোষ্ঠীর বসবাস ছিল। এই অস্ট্রালয়েডরাই এ অঞ্চলের আদি অধিবাসী। এদের ভাষা ছিল অস্ট্রিক (Austric)। ভাষাচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে, এরাই প্রথম গাঙ্গেয় ব-দ্বীপাঞ্চলে কৃষিজীবী সভ্যতা গড়ে তুলেছিল। খাদ্যশস্যকে কেন্দ্র করে ওই সভ্যতার বিকাশ ঘটে। তখন খাল-বিল ও নদী-জলাশয়ের ধারে উৎপাদিত হত বন্য ধান (Orzya Sativa var fatua)। এই বন্য ধান থেকে পরবর্তীকালে আবাদি ধানের উদ্ভব হয়। নদ-নদী, খাল-বিল-জলাশয়ময় পরিবেশে যদিও প্রথম দিকে আদি অস্ট্রেলিয়দের জীবন রক্ষার উপায় ছিল মৎস্য শিকার; পরে তারাই শুরু করে কৃষিকাজ। এরা ধান চাষের সঙ্গে পান, কলা, লাউ, বেগুন, কুমড়া, ঝিঙে, কাকরোল, কচু, নারকেলেরও চাষ করতো। এই নামগুলি সবই অস্ট্রিক। শুধু তাই নয়, কৃষিসংস্কৃতির সঙ্গে যুক্ত আরও বহু অস্ট্রিক শব্দ রয়েছে- বরজ, লাঙল, পগার মুঠা, দড়ি, মই, জোয়াল, দা, মাঙল, পাল, নোঙর, দোনা, কেড়ুয়াল, বুড়ি, চাঙারি, চুপরি, কাঠা, চালনি, রঘুশাইল (ধান), বিরামশাইল (ধান) এবং খলসে, রুই বোয়াল, পুঠি, আইড়, শোল, চিতল প্রভৃতি মাছের নাম। ভাত খাওয়ার অভ্যাস অস্ট্রিকভাষী আদি-অস্ট্রালয়েডদের দান বলে প্রায় সকল পণ্ডিতই একমত হয়েছেন।

ভূ-তাত্ত্বিক, নৃবিজ্ঞানী এবং প্রত্নবিদদের ব্যাখ্যার অনুবৃত্তিক্রমে একথা তো বলাই যায়, গাঙ্গেয় ব-দ্বীপাঞ্চলে সাত কি আট হাজার আগে যে কৃষিজীবী সভ্যতা গড়েছিল- ধানই ছিলো যে জনগোষ্ঠী জীবন রক্ষার প্রধান আহার্য। পাকা ধান ঘরে তোলার পর আনন্দে তারা মেতে উঠতো নিশ্চয়ই। তখনো তো থাকতো ফসলহীন শস্যক্ষেত, মেঘমুক্ত আকাশ, নিস্তরঙ্গ নদী-খাল-বিল। ঘরে কিছু খাবারের সঞ্চয় রয়েছে- এখনকার বর্ষবরণ উৎসবের মতো সেই আদি অধিবাসীরাও কী আজকের মতো কোন আনন্দে মেতে উঠতো?

সিংহাসনে আরোহণের পর মোঘল সম্রাট আকবর দেখেন, তাঁর বিশাল সাম্রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে আলাদা আলাদা দিনপঞ্জি চালু রয়েছে, যার অধিকাংশই চান্দ্রবর্ষের হিসেবে এবং হিজরি সালের সঙ্গে সামঞ্জস্যহীন। সঠিকভাবে দিন, তারিখ ও সময়ের হিসেব রাখায় বিপত্তির সৃষ্টি হচ্ছে। বার্ষিক খাজনা আদায়ের ক্ষেত্রেও হচ্ছে অসুবিধা। এজন্য সম্রাট আকবর তার প্রধান জ্যোতির্বিদ ফতুল্লাহ্ সিরাজীকে সঠিকভাবে একটি দিনপঞ্জি তৈরির নির্দেশ দেন। ফতুল্লাহ সিরাজী, রাজা শশাঙ্ক প্রণীত বঙ্গাব্দকেই দিন-পঞ্জির জন্য অধিকতর নির্ভরযোগ্য মনে করেন। তবে ওই জ্যোতির্বিদ, একই সঙ্গে বার মাসের নামও রাখেন- কারওয়াদিন আরদি, বিহিসু, খোরদাদ, তীর, আমরদাদ, শাহ্‌রিয়ার, আবান, আজুর, দাই, বাহাম, ইস্কান্দার। বলাবাহুল্য, ফতুল্লাহ সিরাজীর বারমাসের নামগুলি পরবর্তীকালে জনগণের স্বীকৃতি পায়নি।

লেখক: গবেষক, অধ্যাপক, সিরাজেল ফাউস, রাজশাহী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, নাটোর এবং প্রাক্তন অধ্যাপক, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

১৭ এপ্রিল ঐতিহাসিক মুজিবনগর দিবস

মুজিবনগর সরকারের নেতৃবৃন্দের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি

মোহাম্মদ শাহজাহান

যে জাতি তার মহান সন্তানদের ভুলে যায়, সে জাতি কখনো বড় হতে পারে না। বাঙালির হাজার বছরের ইতিহাসে কোনো স্বাধীন ভূখণ্ড ছিল না। তেইশ বছরের আন্দোলন-সংগ্রামের ফসল হচ্ছে স্বাধীন বাংলাদেশ। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি ইতিহাসের মহানায়ক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে বাঙালি জাতি ১৯৭১ সালে প্রথমবারের মতো স্বাধীনতা অর্জন করে। এসময় বীরের জাতি হিসেবে বাঙালির সুখ্যাতি সমগ্র বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে। অন্যদিকে স্বাধীনতা অর্জনের মাত্র সাড়ে ৩ বছরের মাথায় স্বাধীনতাবিরোধী দেশীয় ও আন্তর্জাতিক চক্র স্বাধীন বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠাতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবারে হত্যা করে। জাতির পিতাকে হত্যার তিন মাসেরও কম সময়ের মধ্যে বঙ্গবন্ধুর অনুপস্থিতিতে ১৯৭১ সালে মুক্তিকালীন সরকারের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ, অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম এবং মন্ত্রিসভার সদস্য এম মনসুর আলী ও এএইচএম কামারুজ্জামানকে হত্যা করা হয়।

১৯৭১-এর ২৫ মার্চ রাতে পাকিস্তান সামরিক চক্র নিরস্ত্র বাঙালির ওপর সশস্ত্র হামলা চালায়। তারা নির্বিচারে মানুষ হত্যা করতে থাকে। গ্রেফতার হওয়ার আগে পূর্ব-পরিকল্পিতভাবেই বাঙালি জাতির নির্বাচিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণা রাতারাতি সমগ্র বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে। মুক্তিসংগ্রামের প্রধান নেতা বঙ্গবন্ধুর গ্রেফতার বরণের পর তাজউদ্দীন আহমদ অত্যন্ত দক্ষতার সাথে স্বাধীনতাযুদ্ধ পরিচালনা করেন। ২৫ মার্চ রাতে অনেক নেতাই বঙ্গবন্ধুকে আত্মগোপন করার পরামর্শ দেন। কিন্তু তাঁর সিদ্ধান্তে অটল থেকে তিনি অন্য সবাইকে নিরাপদে চলে যাওয়ার পরামর্শ দেন। ব্যারিস্টার আমীর-উল-ইসলামের দেয়া তথ্য অনুযায়ী ২৫ মার্চ রাতে তাজউদ্দীন আহমদ লুঙ্গি ও পাঞ্জাবি পরে, কাঁধে একটা ব্যাগ ঝুলিয়ে এবং ঘাড়ে একটি রাইফেল নিয়ে তাঁর বাসা থেকে বের হন। আরহাম সিদ্দিকীর মাধ্যমে তিনি এই রাইফেল সংগ্রহ করেন। এরই মধ্যে তাজউদ্দীন আহমদ রাইফেল প্রশিক্ষণও গ্রহণ করে ফেলেন।

তাজউদ্দীন আহমদ, ড. কামাল হোসেন ও আমীর-উল-ইসলাম ২৫ মার্চ রাতে এক বাড়িতে একত্র হওয়ার কথা ছিল। এই তিনজন '৭১-এর মার্চে বঙ্গবন্ধুর পরামর্শ অনুযায়ী অসহযোগ আন্দোলনের দিনগুলোতে সকল কর্মসূচি প্রণয়ন করতেন। ড. কামাল হোসেন শেষ পর্যন্ত ওই রাতে নির্ধারিত বাড়িতে একত্রিত হননি। পরে তিনি গ্রেফতার হয়ে পাকিস্তানি কারাগারে বন্দি থাকেন। '৭২-এর ১০ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধুর সাথে তিনি একই বিমানে স্বদেশে ফিরে আসেন। ২৫ মার্চ রাতে ড. কামাল হোসেন কী কারণে তাজউদ্দীন আহমদ ও আমীর-উল-ইসলামের সাথে একত্রিত হননি- এই বিষয়টি আজো পরিষ্কার হয়নি। ড. কামাল সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে স্বেচ্ছায় কারাবন্দীত্ব গ্রহণ করেছিলেন কিনা, গত তিন যুগে একবারও তিনি এই বিষয়ে মুখ খোলেননি। দু'রাত একদিন গোলাগুলির মধ্যে আটক থেকে ২৭ মার্চ তাজউদ্দীন ও আমীর-উল-ইসলাম ঢাকা ছাড়েন। এ দু'জন নানা জনপদ ঘুরে ২৯ মার্চ সন্ধ্যায় ঝিনাইদহে এসে উপস্থিত হন। ৩০ মার্চ বিকেলে তারা মেহেরপুরের মহকুমা প্রশাসক তৌফিক-ই-এলাহী চৌধুরী ও ঝিনাইদহের পুলিশ সুপার মাহবুব উদ্দিনকে নিয়ে সীমান্তের দিকে অগ্রসর হন।

ভারতীয় বিএসএফের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা গোলক

মজুমদারের সহায়তায় তাজউদ্দীন আহমদ ও ব্যারিস্টার আমীর সীমান্ত অতিক্রম করে ওই রাতে কলকাতা পৌঁছেন। রাতেই একটি সামরিক বিমানে তারা দিল্লি চলে যান। প্রকৃতপক্ষে ২৫ মার্চের পর ভারতীয় কর্তৃপক্ষের সাথে বাংলাদেশের এটাই ছিল প্রথম যোগাযোগ। তবে ভারত সরকারের সাথে আওয়ামী লীগের উচ্চপর্যায়ের নেতাদের একটা পূর্ব-যোগাযোগ ছিল। তাজউদ্দীন আহমদের ঘনিষ্ঠ সহকর্মীদের অন্যতম মঈদুল হাসান তার 'মূলধারা ৭১' গ্রন্থে এ তথ্য উল্লেখ করেছেন। ওই গ্রন্থে রয়েছে, শেখ মুজিবের নির্দেশে '৭১-এর ৬ মার্চ তাজউদ্দীন আহমদ ঢাকাস্থ তৎকালীন ভারতীয় ডেপুটি হাই-কমিশনার কেসি সেনগুপ্তের সাথে দেখা করেন। দুর্যোগে পড়লে ভারত বাংলাদেশকে কীভাবে কতটুকু সাহায্য-সহায়তা করবে, ওই বৈঠকে তাই নিয়ে আলোচনা হয়। এই বৈঠকের পর কেসি সেনগুপ্ত বিষয়টি নিয়ে আলোচনার জন্য দিল্লি যান। ঢাকা ফিরে কেসি সেনগুপ্ত ১৭ মার্চ তাজউদ্দীন আহমদকে আশ্বস্ত করেন যে, পাকিস্তান সামরিক আঘাত হানলে ভারত যথাসম্ভব সাহায্য-সহায়তা করবে। ভারতীয় সাহায্যের রূপরেখা কী হবে, সে বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার জন্য ২৪ মার্চ মিলিত হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু দুর্যোগপূর্ণ রাজনৈতিক পরিস্থিতির কারণে ওই বৈঠকটি আর অনুষ্ঠিত হতে পারেনি। এই অসমাপ্ত সংলাপের কারণে মুক্তিবাহিনীকে অস্ত্র, গোলাবারুদ সরবরাহ ও ভারতের মাটিতে মুক্তিবাহিনীর নিরাপদ বেস (Base) গঠনের বিষয়টি আর স্থির হতে পারেনি।

৩০ মার্চ রাতে দিল্লি পৌঁছার পর তাজউদ্দীন আহমদ ৪ এপ্রিল ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ভারতরত্ন ইন্দিরা গান্ধীর সাথে সাক্ষাৎ করেন। ওই সাক্ষাতে কোনো সহযোগী ছিল না। সাক্ষাৎ শেষে সহকর্মী আমীর-উল-ইসলামকে জানান, মিসেস গান্ধী বারান্দায় পায়চারী করছিলেন। তাজউদ্দীন আহমদের গাড়ি পৌঁছার পর তাঁকে ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী স্টাডি-রুমে নিয়ে যান। স্বাগত সম্ভাষণ জানিয়ে মিসেস গান্ধী প্রশ্ন করেন- 'হাউ ইজ শেখ মুজিব? ইজ হি অলরাইট?' জবাবে তিনি বলেন, 'বঙ্গবন্ধু আমাদের দায়িত্ব দিয়ে পাঠিয়েছেন। ২৫ মার্চের পরে তাঁর সাথে আমাদের যোগাযোগ হয়নি।' তাজউদ্দীন আরো বলেন, 'বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধ শুরু হয়েছে। যে কোনো মূল্যে আমাদের স্বাধীনতা অর্জন করতে হবে। মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য অস্ত্র এবং প্রশিক্ষণ প্রয়োজন। আশ্রিত শরণার্থীদের জন্য প্রয়োজন আশ্রয় ও খাদ্য।' তিনি আরো বলেন, 'পাকিস্তান সরকার আমাদের পরিস্থিতিকে আন্তর্জাতিকীকরণের চেষ্টা চালাবে। কিন্তু তাদের এই চেষ্টা কোনোভাবেই সফল হতে দেয়া যাবে না।' তিনি জানান, 'আমাদের পররাষ্ট্রনীতি হবে জোটনিরপেক্ষ, সকলের সঙ্গে বন্ধুত্ব, কারো প্রতি শত্রুতা নয়। বাংলার মানুষের সংগ্রাম, মানবতার পক্ষে ও হিংস্র ফ্যাসিবাদের বিপক্ষে। সকল গণতন্ত্রকামী মানুষ ও সরকারের সহযোগিতা আমরা চাই।' মাতৃভূমির স্বাধীনতাযুদ্ধে তাজউদ্দীন আহমদ ভারত সরকারের সার্বিক সহযোগিতা কামনা করেন।

২৫ মার্চে পাকিস্তানি আঘাতের সাথে সাথে বাংলাদেশের মানুষ স্বাধীনতা রক্ষার জন্য হানাদারদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ে। কিন্তু পাকিস্তানি আঘাতের পর আওয়ামী লীগের নেতারা একে অপরের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন। কে জীবিত আছেন, কে নেই, তাও তারা জানেন না। বঙ্গবন্ধু কোথায়? তিনি কি অবস্থায় রয়েছেন? তাও কারো জানা ছিল না। তিনি গ্রেফতার হয়েছেন নাকি পাকিস্তানি দস্যুরা তাঁকে হত্যা করেছে, একথাও কেউ জানে না। তবে সবচেয়ে নিষ্ঠুর সত্য হলো, মুক্তিসংগ্রামের মূল নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তখন শত্রুর হেফাজতে বন্দি। তাজউদ্দীন উপলব্ধি করেন, 'স্বাধীনতাযুদ্ধ পরিচালনার জন্য জরুরিভাবে একটি সরকার গঠন করা প্রয়োজন। প্রয়োজন একটি বেতার স্টেশনের।' কিন্তু পঁচিশে মার্চের আঘাতের ১১/১২ দিন পরও কোনো নেতার হদিস মিলছে না। একমাত্র লোক আমীর-উল-ইসলাম, যার সাথে তিনি পরামর্শ করতে পারেন। তবে যে কোনো কারণেই হোক, বঙ্গবন্ধুর গ্রেফতারের পর পরবর্তী সরকারের গঠন প্রণালী নিয়ে কোনো সিদ্ধান্ত বঙ্গবন্ধুও দিয়ে যাননি।

অন্য সকল প্রধান নেতাদের অনুপস্থিতিতে কে সরকার বা রাষ্ট্রপ্রধান হবেন, উপরের সারির নেতারা কে কোথায় রয়েছেন, কেউ গ্রেফতার বা নিহত হয়েছেন কিনা- এসব কোনো কিছুই তাজউদ্দীন আহমদের তখনো জানা ছিল না। প্রথম সাক্ষাতের এক সপ্তাহের মধ্যেই তিনি দ্বিতীয়বারের মতো ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীর সাথে বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধ নিয়ে মতবিনিময় করেন। ব্যারিস্টার আমীর-উল-ইসলামের পরামর্শে বঙ্গবন্ধুকে রাষ্ট্রপ্রধান, সৈয়দ নজরুল ইসলামকে উপ-রাষ্ট্রপ্রধান করে তাজউদ্দীন নিজেই প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব নিলেন। শত্রুর হাতে বন্দি বঙ্গবন্ধুকে রাষ্ট্রপতি এবং তখনো দেখা মিলেনি সৈয়দ নজরুল ইসলামকে উপ-রাষ্ট্রপতি করাটাও কম ঝুঁকিপূর্ণ কাজ ছিল না। ১০ এপ্রিল স্বাধীন বাংলাদেশের সরকার গঠনের কথা বেতারের মাধ্যমে বিশ্ববাসী জেনে যায়। ১০ এপ্রিল প্রচারের জন্য প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদের ভাষণও রেকর্ড করা হয়। ইতিমধ্যে শেখ ফজলুল হক মণির নেতৃত্বে যুব ও ছাত্র নেতৃবৃন্দসহ কয়েকজন আওয়ামী লীগ নেতা কলকাতা পৌঁছে তাজউদ্দীন আহমদের প্রধানমন্ত্রী হওয়াসহ সরকার গঠনের ব্যাপারে ভিন্নমত প্রকাশ করেন। ১০ এপ্রিল প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের পূর্বাপর পরিস্থিতি বর্ণনা করে এক গুরুত্বপূর্ণ দীর্ঘ ভাষণ দেন। প্রধানমন্ত্রীর এই ভাষণ বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাসে এক অমূল্য দলিল হিসেবেই বিবেচিত হয়। ১০ এপ্রিলের পর প্রথমে এম মনসুর আলী ও কামারুজ্জামান, তারপর সৈয়দ নজরুল ইসলাম, আবদুল মান্নান এবং আরো পরে খন্দকার মোশতাকসহ অন্য নেতারা কলকাতা পৌঁছেন। মোশতাক ও যুবনেতাদের বিরোধিতা সত্ত্বেও সৈয়দ নজরুল ইসলাম, এম মনসুর আলী ও এএইচএম কামারুজ্জামানের সমর্থন ও সহযোগিতায় তাজউদ্দীন আহমদ ঘোষিত সরকার বহাল থেকে যায়।

১৭ এপ্রিল বাংলাদেশের মাটিতে মেহেরপুরের আম্রকাননে স্বাধীন বাংলাদেশ সরকার আনুষ্ঠানিকভাবে শপথগ্রহণ করে। অনুষ্ঠানে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী ভাষণ দেন। ব্যারিস্টার আমীর-উল-ইসলাম রচিত স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র পাঠ করেন চিফ হুইপ অধ্যাপক ইউসুফ আলী। ব্যারিস্টার আমীর-উল-ইসলাম রচিত স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রটি আমাদের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে আরেকটি অমূল্য দলিল হয়ে রয়েছে। প্রধানমন্ত্রী

তাজউদ্দীন তাৎক্ষণিকভাবে প্রবাসী সরকারের রাজধানীর নামকরণ করেন মুজিবনগর। পররাষ্ট্রমন্ত্রী খন্দকার মোশতাক, কয়েকজন যুব ও ছাত্রনেতাসহ বেশকিছু আওয়ামী লীগ নেতার অসহযোগিতা এবং বিরোধিতার মুখেও সৈয়দ নজরুল ইসলাম, মনসুর আলী ও কামারুজ্জামানের অকুণ্ঠ সমর্থন ও সহযোগিতায় স্বাধীনতা যুদ্ধের সফল পরিসমাপ্তি ঘটাতে সক্ষম হন প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ। মোশতাক গং আমেরিকার চক্রান্তে একবার ধুয়া তোলেন, 'স্বাধীনতা পেলে শেখ মুজিবকে জীবিত পাওয়া যাবে না, আর শেখ মুজিবকে পেলে স্বাধীনতা পাওয়া যাবে না।' ওই কঠিন পরিস্থিতিতে আওয়ামী লীগের এমএনএ ও এমপিএদের এক যৌথ সভায় তাজউদ্দীন আহমদ তাঁর জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ ভাষণে যুক্তিতর্ক দিয়ে বুঝিয়ে বলেন, 'আমরা স্বাধীনতা ও বঙ্গবন্ধু দুটিই চাই। একটিকে বাদ দিয়ে অন্যটিকে চাই না।' প্রধানমন্ত্রীর ভাষণ এতটাই প্রাণস্পর্শী ও যুক্তিযুক্ত ছিল যে, কয়েকজন চক্রান্তকারী ছাড়া সভায় উপস্থিত সকলে উচ্চস্বরে তাজউদ্দীনের সমর্থনে স্লোগান দিতে থাকেন।

আরেকবার ওই বিপদ থেকে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ও তাজউদ্দীনকে রক্ষা করেন ময়েজউদ্দিন আহমদ। ভারতে তাজউদ্দীন-বিরোধী ষড়যন্ত্র জোরালো হয়ে উঠলে মিসেস গান্ধী প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীনকে এমপিএ ও এমএনএদের আস্থা নিতে বলেন। '৭১-এর ৫ জুলাই জলপাইগুড়িতে আওয়ামী লীগের জনপ্রতিনিধিদের ওই সভা হয়। মেজর রফিকুল ইসলাম পিএসসি'র (সেক্টর কমান্ডার মেজর রফিক নন) ১৯৯৩ সালে প্রকাশিত 'মুক্তিযুদ্ধে প্রবাসী সরকার' গ্রন্থে ওই সভার কথা লিপিবদ্ধ হয়েছে। এই সভায় শেখ আবদুল আজিজ, প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীনের বিরুদ্ধে অনাস্থা আনার পক্ষে জোরালো বক্তব্য শুরু করলে চক্রান্তকারীরা উল্লাসমুখর হয়ে ওঠে। ওই পরিস্থিতিতে ময়েজউদ্দিন আহমদ নাটকীয়ভাবে মঞ্চে উঠে শেখ আজিজকে শার্টের কলার ধরে ধাক্কা দিয়ে মঞ্চ থেকে ফেলে দিয়ে নিজে প্রধানমন্ত্রীর সমর্থনে এক আবেগময়ী জোরালো ভাষণ দেন। ২৩৯ জন এমপিএ ও ১৩৫ জন এমএনএ উপস্থিত থাকা ওই সভায় তাজউদ্দীন আহমদের পক্ষে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। ময়েজউদ্দিন আহমদ বঙ্গবন্ধু হত্যার পর খুনি মোশতাক আহূত এমপিদের সভায়ও বঙ্গবন্ধুর প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে জোরালো বক্তব্য দিয়েছিলেন। চক্রান্তকারী মোশতাক গংয়ের উদ্দেশ্য ছিল তাজউদ্দীনকে সরিয়ে মোশতাককে প্রধানমন্ত্রী করা। আর যুক্তরাষ্ট্রের সমর্থনে ইরানের শাহের মধ্যস্থতায় পাকিস্তানের সাথে সমঝোতায় পৌঁছে বাংলাদেশের স্বাধীনতাকে নস্যাৎ করা।

মেজর রফিকুল ইসলাম পিএসসি তার ওই গ্রন্থে আরো লিখেছেন, '৭১-এর ১১ জুলাই কলকাতার থিয়েটার রোডে প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীনের সভাপতিত্বে সেক্টর কমান্ডারদের এক সভার কথা। এতে বলা হয়, মেজর জিয়াউর রহমান এক পর্যায়ে ওই সভায় অবিলম্বে একটি যুদ্ধ কাউন্সিল গঠনের প্রস্তাব করেন। প্রস্তাবে কর্নেল ওসমানীকে প্রধান সেনাপতির পদ থেকে সরিয়ে প্রতিরক্ষামন্ত্রী করার কথা বলা হয়। এই প্রস্তাবের উদ্দেশ্য ছিল দুটি। ওই প্রস্তাব গৃহীত হলে যুদ্ধ পরিচালনার ব্যাপারে একদিকে সামরিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে, অন্যদিকে ওসমানী অপসারিত হলে সর্বজ্যেষ্ঠ সামরিক অফিসার মেজর জিয়া প্রধান সেনাপতি হবেন। মেজর সফিউল্লাহ ও মেজর খালেদের বিরোধিতার কারণে যুদ্ধ কাউন্সিল গঠনে মেজর জিয়ার প্রস্তাব গৃহীত হয়নি। ওই প্রস্তাবের পর কর্নেল ওসমানী পদত্যাগ করেন। প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন অনেক বুঝিয়ে ওসমানীকে পদত্যাগপত্র প্রত্যাহারে রাজি করান। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে মেজর জিয়ার সঙ্গে কর্নেল ওসমানীর সম্পর্কের অবনতি ঘটে। যার জন্য স্বাধীনতাযুদ্ধকালে ('৭১) মেজর জিয়াকে তিনবার গ্রেফতার করতে প্রধান সেনাপতি ওসমানী নির্দেশ দিয়েছিলেন। জাতীয় সংসদে উইং কমান্ডার সফিউল্লাহ এই তথ্য দেন। (মেজর রফিকের লেখা নিবন্ধ। মাহবুব করিম সম্পাদিত 'তাজউদ্দীন আহমদ- নেতা ও মানুষ' গ্রন্থ, পৃষ্ঠা-৮৯)।

তাজউদ্দীন আহমদ ও সৈয়দ নজরুল ইসলামের সুযোগ্য, দূরদর্শী ও সফল নেতৃত্বে একাত্তরের ১৬ ডিসেম্বরের বিজয়ের পর ১২ জানুয়ারি '৭২ বঙ্গবন্ধু প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। মোশতাক ও উচ্চাভিলাষী চক্রান্তকারীরা অবশেষে সফল হলো। বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে ১৯৭৪-এর ২৬ অক্টোবর অর্থমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ পদত্যাগ করেন। রাজনৈতিক বিশ্লেষক ও ইতিহাসবিদরা নিশ্চয়ই একদিন বলবেন, ভারতের গান্ধী-নেহরু, চীনের মাও-চৌএনলাইয়ের মতো আরেক সফল জুটি ছিলেন বাংলাদেশের মুজিব-তাজউদ্দীন জুটি। আসলে তাজউদ্দীন আহমদ ছিলেন বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য সিপাহসালার। অনেকেই বলেন, জাতির পিতা শেখ মুজিবের অবর্তমানে তাজউদ্দীন আহমদ প্রধানমন্ত্রী ছিলেন বলেই এত ষড়যন্ত্র-চক্রান্তের মধ্যে ৯ মাসে বিজয় অর্জন সম্ভব হয়েছিল। তবে স্বীকার করতেই হবে, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের কালজয়ী নেতৃত্বেই ২৩ বছরের সংগ্রামে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে। শেখ মুজিবের তুলনা শুধুই শেখ মুজিব। ২৫ মার্চ রাতে আত্মগোপন না করে স্বাধীনতা ঘোষণার পর বাসভবনে অবস্থান করেছিলেন বলেই আমেরিকা-চীন সরকারের বিরোধিতার মুখেও বিশ্বের অন্য প্রায় সকল দেশের সরকার ও জনগণ বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধকে সমর্থন করেছিল। শত্রুর কারাগারে বন্দি থাকা সত্ত্বেও শেখ মুজিবকেই বাংলাদেশ সরকারের রাষ্ট্রপ্রধান বানানো হয়েছিল। তাঁর নামেই মুক্তিযুদ্ধ পরিচালিত হয়েছে। মুক্তিযোদ্ধারা তাঁর নামেই জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু বলে হাসতে হাসতে জীবন দিয়েছেন। মনীষী আবুল ফজল যথার্থই বলেছেন, 'দেড় হাজার মাইল দূরে পাকিস্তানি কারাগারে বন্দি শেখ মুজিব বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে নেতৃত্ব দিয়েছেন। এমন অনুপস্থিত সেনাপতির সেনাপতিত্ব ইতিহাসে বিরল।' মুজিবনগর সরকারের নেতৃবৃন্দের প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা।

লেখক: বীর মুক্তিযোদ্ধা
একাত্তরে দাউদকান্দি থানা মুজিব বাহিনীর প্রধান
সাপ্তাহিক বাংলাবার্তা সম্পাদক

আমি এক জীবন্ত নুড়ি

মমতা মজুমদার

আমি রোজ মৃত্যুকে পাশ কাটিয়ে চলে আসি,
অবারিত দুঃখের ভার বয়ে যে নদী শুকিয়েছে
আমার অন্তঃপুরে;
তাকে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে কেটেকুটে আবার দু-হাতে
পরেছি গলায় ফাঁসি।
যন্ত্রণার চিবুকে দগ্ধ হয়েছে যে জ্বলে পুড়ে প্রতিদিন,
তার সাথে দিয়েছি চিরতরে আঁড়ি।
স্মৃতিতে কিছুই ফিরে পাওয়ার নেই কোন বাহাদুরি।
যে ব্যথা আজন্ম দিয়েছে আমায় লাঞ্ছনা-বঞ্চনা
তার থেকে বহুবার মুখ ফিরিয়ে এসেছি।
মৃত্যুর স্বাদ নিতে নিতে এখন আমি এক জীবন্ত নুড়ি।
আমাকে ধ্বংসের মুখোমুখি দাঁড়াতে করো না
কেউ প্রতিযোগী।
আমি তো মরেছি দগ্ধ অনলে, পুড়ে গেছে দেহের
একবিংশ শতাব্দী।
দুঃখের সমাধি দিয়েছি নিজ হাতে, হেসেছি নিজেই
আগুনে পুড়ি।
জীবননাশের আশঙ্কা নেই, নেই আর কোন
প্রশান্তির আহামরি।
কষ্টের আদুরে গিলে গেছে সময়গুলো;
বেহুলায় ভেসে ভেসে দেখে যাই আজ শুধু মৃত্যুপুরি।

বিয়োগান্ত অধ্যায়

ফারজানা ইয়াসমিন

জীবনের এতোগুলা দিনপঞ্জি ঘুরে
শেষ সীমানায় এসে রচিত হলো,
এক বিয়োগান্ত অধ্যায়।
নিস্তব্ধতা বিদীর্ণ করে মনের কার্ণিশে
স্বচ্ছ জলে সাঁতার কাটে,
মাছরাঙা মন তৃষ্ণায়।
হৃৎপিণ্ড জুড়ে বিষন্নতার দীর্ঘশ্বাস
একাকী বিরহী মনের অব্যক্ত কাব্য,
ঝরে পড়ে পাতাঝরা দিনের মতো।
চিরযৌবনা রোদেলা দিন হারায়
ধূসর কুয়াশায় ঢাকা পথের বাঁকে,
মনকানা ভালোবাসা মিথ্যায় জড়িয়ে।
চেনা জীবনের অলিগলিতে ওঁত পেতে
চোরাকাঁটা বসে আছে ঘাপটি মেরে,
অদৃশ্য আঘাত ক্ষত বিক্ষত করে।
অপেক্ষায় থাকে অবাধ্য মন
হারানো জীবনের কাঙ্ক্ষিত প্রহরের,
স্মৃতি শুধু চাপা আগুন উসকে তোলে।

আমাকে চলে যেতে হবে

মিয়া সালাহউদ্দিন

আমাকে চলে যেতে হবে
আমাকে চলে যেতে হবে মাটির বিছানায়
এই সুন্দর পৃথিবীর মায়া কাটিয়ে
আমাকে চলে যেতে হবে।

প্রতিদিন বাগানের ফুল ফুটবে
পাখিরা আকাশে উড়ে বেড়াবে
নদীর জল সাগরে মিশে যাবে
ভোরের আলোয় প্রকৃতি সজীব হবে
পাহাড়ের ঝরনা মাটিতে পড়বে
ফসলে ফসলে ভরে উঠবে মাঠ
কৃষকের গোলা নতুন ধানে ভরে যাবে।

প্রিয়তমা আমাকে আর ডাকবে না
একদিন দুঃখভরা চোখের জল মুছে যাবে
শুধু আমিই থাকবো না।

যে শিশুটি মুচকি হেসে এসেছিল ধরণীতে
একবুক ভালোবাসা নিয়ে তাকে চলে যেতেই হবে।

নামলিপি

মুহাম্মদ ফরিদ হাসান

সেই নারীটির ঘর চেনে না কেউ।

নির্ঘুম নীলনদ-তীরে
কফিন ছিল শত-সহস্র
মমির পিরামিডে ডুবে আছে বালিয়াড়ি
লাজুক পাতাটিও জানে না ঠিকানা তার।

উঠের জাহাজে ভাসে ক্যারাভান
উড়ে ধুলো উড়ে চাঁদ-ঝালর
নিভে পিপাসা, ডুবে পাথর অনন্তে
তবু ঠোঁট জানে না মেয়েটির নাম।

প্রেম এক অঙ্কগলি, সুরার পেয়ালা
যে আসে তীব্র ভালোবেসে
জিইয়ে রাখে পাহারা
মরুঝড়ে
এফিটাপে
মমির ভাঁজে
লেগে থাকে মেয়েটির নাম
হাজার বছর।

ইদের নামাজ ইদের শিক্ষা

মাওলানা মুফতী মোঃ ওমর ফারুক

‘প্রাত্যহিক জীবনেও দেখা যায় কেহ হাসে কেহ কাঁদে কেহ বা জীবনের সকল রঙ্গখেলার সমাপ্তি ঘটিয়ে হাসপাতালের বিছানায় অথবা জেলহাজতের ভিতরেই জীবন নামের ইতি টানেন। কবর নামক বাহনে চড়ে পরপারে রওনা করেন। খুশি বা আনন্দ দুনিয়াতে সবার জন্য সবসময় নয়। কালের আবর্তনে জীবনের খেলাঘরে যারা ভাল করে তারাই কেবল সফল, তদ্রূপ ঈদের আনন্দ-খুশি, পুরস্কার তাদের জন্যই যারা জীবনের পরতে পরতে মহান মাবুদের নির্দেশিত পথে পথ চলতে বদ্ধপরিকর। ইদুল ফিতরের আনন্দ মূলত যারা রমজানের সিয়াম সাধন করেছেন তাদের জন্য। যদিও সমাজের অনেক মানুষ খামখেয়ালি ও বেহুদা কাজেই রোজা পালন করে না।’

ইদ আরবি শব্দ এর আভিধানিক অর্থ খুশি বা আনন্দ। ইদ বলতে ইদুল ফিতর ও ইদুল আযহা বা কুরবানির ইদ কে বুঝায়। ইদ শব্দটি আরবি উয়ূদ শব্দ হতে গৃহীত। এর অর্থ বারবার ফিরে আসা । যেহেতু ইদ প্রতি বছরই ফিরে আসে এবং এলাকার লোকজন ইদের মাঠে গিয়ে একত্রিত হয়ে কুশলাদি বিনিময় করে আনন্দ লাভ করে তাই একে ইদ বলা হয়। প্রতিবছর মুসলিম উম্মাহ দু'টি ইদ উদযাপন করে। দীর্ঘ এক মাস সিয়াম সাধনের পর শাওয়াল মাসের প্রথম দিন বা ইদুল ফিতর নামে পরিচিত। আর একটি যিলহজ্জ মাসের দশ তারিখ যা ইদুল আযহা বা কুরবানির ইদ হিসাবে বিশ্ব মুসলিম উম্মাহর নিকট পালিত হয় যার গুরুত্ব ও তাৎপর্য অপরিসীম। ইদ মুসলমানদের আনন্দের দিন পুরস্কার প্রাপ্তির দিন দীর্ঘ এক মাস সিয়াম সাধনের পর ফলাফল প্রকাশের দিন

কিন্তু ফলাফল কাদের জন্য, যারা পরীক্ষায় অংশ নিয়ে ভালোভাবে পরীক্ষা দিয়েছে তারাই কেবল ফলাফলের প্রত্যাশা করতে পারে। তবে আশ্চর্যজনক হলেও সত্য যে এ দেশে মাহে রমজানের এক মাসের পরীক্ষায় অংশগ্রহণ না করেও অনেক মুসলমান প্রথম সারির পুরস্কার নেয়ার লোভে সবার আগের কাতারে বসেন। বাস্তবতা সম্পূর্ণ ভিন্ন তারা যতই সেজেগুঁজে বসবে কোনো লাভ নেই- তারা সেদিন মাঠ থেকে অপদস্ত হয়ে তিরস্কৃত হয়ে বাড়ি ফিরবে যদিও তা বাহ্যিক দৃষ্টিতে দেখা যায় না।

প্রাত্যহিক জীবনেও দেখা যায় কেহ হাসে কেহ কাঁদে কেহ বা জীবনের সকল রঙখেলার সমাপ্তি ঘটিয়ে হাসপাতালের বিছানায় অথবা জেলহাজতের ভিতরেই জীবন নামের ইতি টানেন। কবর নামক বাহনে চড়ে পরপারে রওনা করেন। খুশি বা আনন্দ দুনিয়াতে সবার জন্য সবসময় নয়। কালের আবর্তনে জীবনের খেলাঘরে যারা ভাল করে তারাই কেবল সফল, তদ্রূপ ইদের আনন্দ-খুশি, পুরস্কার তাদের জন্যই যারা জীবনের পরতে পরতে মহান মাবুদের নির্দেশিত পথে পথ চলতে বদ্ধপরিকর। ইদুল ফিতরের আনন্দ মূলত যারা রমজানের সিয়াম সাধন করেছেন তাদের জন্য। যদিও সমাজের অনেক মানুষ খামখেয়ালি ও বেহুদা কাজেই রোজা পালন করে না।

ইদের নামাজের হুকুম: হয় তাকবিরের সাথে দু'রাকাত নামাজ পড়া ওয়াজিব। এতে সকল ইমামগণ ঐক্যমত পোষণ করেছেন। রাসূল (সাঃ) মক্কা হতে মদিনায় হিজরতের পর থেকে নিয়মিত তা আদায় করেছেন। জীবনে কখনও তরক করেননি।

নামাজের ওয়াক্ত বা সময়: সূর্যোদয় হওয়ার পর হতে সূর্য মধ্যআকাশে উপনীত হওয়ার মধ্যবর্তী যেকোনো সময় পড়তে হবে। সূর্য পশ্চিম দিকে ঢলে গেলে এ নামাজ পড়া যাবে না। কোনো কারণবশতঃ সূর্য মধ্যগগণে উপনীত হওয়ার পূর্বে নামাজ আদায় করতে না পারলে ইদুল ফিতরের নামাজ পরের দিন ও ইদুল আজহার নামাজ ১২ই যিলহজ্ব পর্যন্ত ঐ ওয়াক্তে আদায় করা যাবে।

ইদের নামাজের স্থান: ইদের নামাজ ও জুম্মার নামাজের মত জামাতে পড়তে হবে। একাকী এ নামাজ আদায় করা যাবে না। জুম্মার নামাজ মসজিদেই আদায় করা হয়। ইদের নামাজ মাঠে পড়া উত্তম ও সুন্নত। বিনা ওজরে ইদের নামাজ মসজিদে আদায় করা মাকরূহ। ঝড়, বৃষ্টি তুফান, মাঠের ব্যবস্থা না থাকা ইত্যাদি ওজরে ইদের নামাজ মসজিদে পড়া যায়।

নিম্নে এর দলিল সমূহ উল্লেখ করা হল:

(১) রাসূল (সাঃ) এর জীবনে মাত্র একবার প্রবল বৃষ্টির কারণে ইদের নামাজ মসজিদে পড়েছিলেন। আর বাকি সারাজীবনই মাঠে পড়েছেন।

(২) রাসূল (সাঃ) এরশাদ করেছেন যে, ইদুল ফিতর ও ইদুল আজহার দিন ইদগাহে গিয়ে ইদের নামাজ আদায় করো। (বুখারি শরিফ)

(৩) হযরত আনাস (রা) হতে বর্ণিত তিনি বলেন- রাসূল (সাঃ) ইদুল ফিতরের দিন কিছু খেজুর বা মিষ্টিজাতীয় দ্রব্য না খেয়ে ইদগাহে যেতেন না। (বুখারি শরিফ)

(৪) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন- রাসূল (সাঃ) ইদুল ফিতরের দিন ইদগাহে যেতেন এবং দুই রাকাত নামাজ আদায় করতেন। যার আগে বা পরে আর কোন নামাজ পড়েননি। তিনি আরো বলেন, রাসূল (সাঃ) এক পথে ইদগাহে যেতেন এবং অন্য পথে ইদগাহ হতে বাড়ি ফিরতেন।

(৫) হযরত জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন রাসূল (সাঃ) দুই ইদের উদ্দেশ্যে বের হতেন এবং তাঁর পরিবার পরিজনকে বের হওয়ার নির্দেশ দিতেন। (মুসনাতে আহমদ)

(৬) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন রাসূল (সাঃ) দুই ইদের নামাজ আদায়ের জন্য ইদগাহের দিকে বের হতেন এবং তাঁর কন্যা ও স্ত্রীগণকেও বের হতে নির্দেশ দিতেন।

(৭) হযরত আয়শা (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন রাসূল (সাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করা হলো মহিলারা কি ইদের নামাজের জন্য ইদগাহে যাবে? তিনি বললেন হ্যাঁ অবশ্যই। জিজ্ঞাসা করা হলো "যুবতী মেয়েরাও কি বের হবে"? তিনি বললেন হ্যাঁ। রাসূল (সাঃ) আরো বলেন নিজের কাপড় না থাকলেও কোনো সঙ্গী-সাথীর কাপড় পড়ে ইদগাহে যাবে। (তিবরানি)

(৮) হযরত উম্মে আতিয়াহ (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন রাসূল (সাঃ) আমাদেরকে ইদুল ফিতর ও ইদুল আযহার দিনে যুবতী, অন্তঃপুরবাসিনী ও হায়েয সম্পন্না মহিলাদেরকে ইদগাহের মাঠে নিয়ে যেতে নির্দেশ দিয়েছেন। (মুসনাতে আহমদ)

(৯) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন রাসূল (সাঃ) একবার ইদের দুই রাকাত সালাত আদায় করেন এবং এর আগে পরে আর কোন সালাত আদায় করেননি। তারপর তিনি মহিলাদের কাছে আসেন এবং তাদেরকে সদকা করার নির্দেশ দেন। তখন উপস্থিত মহিলারা নিজেদের কানের দুল, নাকের বালা ইত্যাদি দান করলো, সাথে হযরত বিলাল (রাঃ) ও উপস্থিত ছিলেন। (বুখারি শরিফ)

(১০) ইজমা: উল্লেখিত হাদিস ও রাসূল (সাঃ) এর সুন্নাহর উপরে সকল আলেম ওলামা ঐক্য মত পোষণ করেছেন যে বিনা ওজরে ইদের সালাত মসজিদে পড়া মাকরূহ। ইদের মাঠ থাকা অবস্থায় ইদের নামায মসজিদে আদায় করা যাবে না।

(১১) হযরত বুরাইদা (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন রাসূল (সাঃ) কিছু না খাওয়া পর্যন্ত ইদগাহে বের হতেন না এবং ইদুল আযহার দিন নামাজ না পড়া পর্যন্ত কিছু খেতেন না।

আমাদের করণীয়: উপরোক্ত হাদিসে কারিমাহ ও মাসাআয়ালার কিতাব হতে এটা পরিষ্কার যে ইদের নামায ইদগাহে পড়া সুন্নত। কোন ওজর ব্যতিত মসজিদে ইদের নামায পড়া মাকরূহ।

মাসআয়ালা-১: ইদের নামায মসজিদে না পড়ে ইদগাহে পড়া সুন্নত আর ইদের মাঠ শহরের বাহিরে হওয়া সুন্নত। কেননা রাসূল (সাঃ) আজীবন মদিনার পাশে বিশাল প্রান্তরে

ইদের নামায আদায় করেছেন। শুধু বৃষ্টির কারণে জীবনে একবার ইদগাহে না গিয়ে মসজিদে নামাজ আদায় করেছেন। হাদিসটি ইমাম আবু দাউদ বর্ণনা করেছেন।

মাসআয়ালা-২: ফতোয়ার কিতাব দুররে মুখতারে রয়েছে ইদের নামাজের জন্য বৃহৎ ময়দানে বের হওয়া সুন্নত- যদিও জামে মসজিদ থাকে এবং লোক সংকুলান হয়।

মাসআয়ালা-৩: ইদের নামাজের জন্য ইমাম সাহেব বিশাল প্রান্তরে বের হওয়া সুন্নত। ইমদাদুল ফতোয়া ১ম খণ্ড পৃষ্ঠা নং ৬১০। দুররে মুখতার ১ম খণ্ড পৃষ্ঠা নং ৭৭৬। আহসানুল ফতোয়া ৪র্থ খণ্ড পৃষ্ঠা নং ১১৯। ফতোয়ায়ে মাহমুদিয়াতে রয়েছে ইদের নামাজ ইদগাহে গিয়ে পড়া সুন্নত। ঝড় বৃষ্টি অথবা অন্য কোন ওজর থাকলে মসজিদে পড়া জায়েজ। তবে রাসুলের অনুসরণের ফজিলত থেকে বঞ্চিত থাকবে। ফতোয়ায়ে মাহমুদিয়া ২য় খণ্ড পৃষ্ঠা নং ২৯৬।

হযরত বকর ইবনে মোবাশের আল আনসারী (রা:) হতে বর্ণিত তিনি বলেন ইদুল ফিতর এবং ইদুল আযহার দিন আমরা রাসুল (সা:) এর সাথে ইদগাহে যেতাম এবং রাসুল (সা:) এর সাথে নামাজ আদায় করে বাড়ি ফিরতাম। আবু দাউদ পৃষ্ঠা ১৬৪।

সর্বোপরি পবিত্র কোরআনে সুরা হাশরের ৭ নম্বর আয়াতে আল্লাহতায়ালা বলেন- তোমাদের জন্য রাসুল (সা:) যা নিয়ে এসেছেন তা গ্রহণ করো এবং যা নিষেধ করেছেন তা বর্জন করো।

আরো এরশাদ হচ্ছে "হে নবি আপনি বলুন তোমরা যদি আল্লাহর ভালোবাসা পেতে চাও তাহলে আমার অনুসরণ কর, তাহলেই তোমরা আল্লাহর ভালোবাসা পাবে, আর তিনি তোমাদের অপরাধসমূহ ক্ষমা করে দেবেন নিশ্চয় তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল ও দয়াময়। (সুরা আলে ইমরান, আয়াত ৩১)

শেষকথা: গ্রামের ছোট ছোট পাড়েগানার সামনে অথবা ছোট ছোট মসজিদের সামনে তো দূরের কথা স্বয়ং রাসুল (সা:) মদিনা শহরেই ইদের নামাজ আদায় না করে শহরের সন্নিকটে মদিনার পার্শ্বে এক বিশাল মাঠে আজীবন ইদের নামাজ আদায় করেছেন। মাত্র একবার প্রবল বৃষ্টির কারণে মসজিদে ইদের নামাজ আদায় করেছেন।

ইদুল ফিতরের শিক্ষা: ইদ মুসলমানদের মহাউৎসব। ইদুল ফিতরের ২/১ দিন আগেই সমাজের হতদরিদ্র অসহায়দের মাঝে সদকাতুল ফিতর বিলিয়ে দিয়ে গরিব-দুঃখী সুবিধাবঞ্চিত মানুষের মুখে হাসি ফুটানোর লক্ষ্যে সদকাতুল ফিতর স্বাধীন মুসলিম নর-নারীদের উপর আবশ্যক করা হয়েছে । এর অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য হলো সকলে মিলে মিশে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে ভ্রাতৃত্ব ও সম্প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে ধনী-গরিব, সাদা-কালো, ছোট-বড়, রাজা-প্রজা এক সারিতে দাঁড়িয়ে মহান আল্লাহর নামের যিকিরে আকাশ বাতাস মুখরিত করে তুলবে এবং তাঁকেই সেজদা করবে মুসলমানরা ইদের শিক্ষাকে কাজে লাগিয়ে ঐক্যবদ্ধভাবে বাকি জীবন পথ চলবে, ভুলে যাবে সকল হিংসা-বিদ্বেষ, সাদা-কালো, ধনী-গরিব, রাজা-প্রজা, উঁচু-নিচু বংশ আভিজাত্যের পার্থক্য কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে বসবাস করার আনুষ্ঠানিক সম্মিলিত ঘোষণাই ইদের মূল শিক্ষা, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য যার সীমানা হবে গোটা দুনিয়াব্যাপী। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় মুসলমানরা আজ সেই ঐক্যের শিক্ষা হতে অনেক দূরে, ফলে ভোগ করতে হচ্ছে নানা ধরনের ভোগান্তি, পুরো মুসলিম উম্মাহ আজ ঘৃণা ও অমর্যাদার পাত্রে পরিণত হচ্ছে। মুসলমানদেরকে নানা দলে গোত্রে বিভক্ত করা হচ্ছে- বিভক্ত হতে শুভাকাঙ্খীর বেশে পরামর্শ দেয়া হচ্ছে। শিয়া সুন্নি ওয়াহাবি মাযহাবি লামাযহাবি ইত্যাদি নামে আখ্যায়িত করা হচ্ছে। আর প্রত্যেক দলের দাবি যে আমাদেরটাই সত্যিকারের ইসলাম আর বাকি সব বাতিল। এর মাধ্যমে নিজেদের দ্বন্দ্ব-কলহে লিপ্ত হওয়ার মধ্য দিয়ে আমাদের ঐক্যের শক্তি ক্ষয় করা হচ্ছে- বাহ্যত তা ধরা পড়ছে না। কাউকে কোনো মাজার বা খানকার বসানো হচ্ছে ধর্মগুরু বা ধর্মপ্রচারক হিসাবে। এতেই তারা খুশিতে আত্মহারা। তারা বছরে একটি ওরস করবে যেখানে মানুষের চেয়ে গরুর উপস্থিতি বেশি। অনেক সময় ভক্তদের মন আকৃষ্টের জন্য পূর্ব থেকেই কিছু গরু মহিষ শোডাউন করার উদ্দেশ্যে জমা করা হয়। যেন প্রত্যেক ভক্ত যেকোন মূল্যে কমপক্ষে ২/১টি গরু বা মহিষ নিয়ে দরবারে হাজির হয়। তাদের ধারণা যে দরবারে যতবেশি গরু সে দরবার ইসলামের তত বড় মারকাজ, আসলে এগুলো ইসলামের মারকাজ নয় বরং ইসলামকে কলুষিত করার আড্ডাখানা ইসলামের সত্যিকারের রূপরেখার উপর কালিমা লেপন করা। আরেক শ্রেণি শুধুমাত্র যিকির আজকারে হরহামেশা ব্যস্ত। আমাদের ধর্ম আজ কালিমালিপ্ত হচ্ছে, পবিত্র স্থানগুলো অপবিত্র করা হচ্ছে। আমাদের অনৈক্যের কারণে- দায়িত্ব সম্পর্কে গাফেল হওয়ার কারণে মুসলমানদেরকে জঙ্গি মৌলবাদী সন্ত্রাসী নিত্য নুতন অপবাদ দিয়ে ঘায়েল করা হচ্ছে। কাজেই গোটা মুসলিম উম্মাহকে আবারও একই প্লাটফর্মে আসতে হবে একই সারিতে দাঁড়াতে হবে- ভুলে যেতে হবে সকল ভেদাভেদ। মহান আল্লাহতায়ালার ঘোষণা "তোমরা সকলেই আল্লাহর রজ্জুকে শক্তভাবে আঁকড়ে ধরো- পৃথক হয়ো না"- সুরা আলে ইমরান আয়াত (১০৩)। যদি তা করা যায়, তাই করতে হবে। এ ছাড়া বিকল্প আর কোন রাস্তা নেই। এটাই হোক ইদের শিক্ষা। একতা ঐক্য ভ্রাতৃত্ব সহযোগিতা, সহানুভূতি পরস্পর ভাই ভাই হয়ে নবউদ্যমে ইদের শিক্ষাকে কাজে লাগানোর প্রেরণা নিয়ে ইদ উদযাপন করা সময়ের দাবি, আল্লাহর নির্দেশ, রাসুলের আদর্শ। আল্লাহ আমাদের সকলকে দ্বিনের সঠিক বুঝ দান করুন। আমিন।

লেখক: গবেষক ও ইসলামি চিন্তাবিদ

ইদ মানে

গোলাম নবী পান্না

অসহায় যারা তাদের পাশেই
দাঁড়াও বন্ধু এসে,
তোমার পরশ পেয়ে যেন তারা
উঠুক একটু হেসে।

ইদ মানে খুশি প্রীতির বাঁধন
ইদ মানে সম্প্রীতি-
এই খুশি নাও ভাগাভাগি করে
এভাবেই এসো জিতি।

ধনী ও গরিব- এই ভেদাভেদ
থাকে না ইদের দিন;
বৈষম্যের কালিমা এদিন
মন থেকে হয় লীন।

এসো বন্ধুরা ইদের শিক্ষা
চিরদিন রাখি ধরে,
সব মানুষের সমান পৃথিবী
সাজাই নতুন করে।

মঙ্গলের আহ্বানে বৈশাখ

এস এম তিতুমীর

খাতা, হাল নাগাদে-
হিসেব শূন্য। চৈত্রসংক্রান্তির পড়ন্ত বেলা
মেলা, ধান কাটা চড়ক তলার বিরান মাঠে
হাঁটে, এখনো হাজার পথিক
হাজার প্রেমিক- প্রেম নিয়ে জীবনের পাটে পাটে
কতো জয়ীতা, জন্মের স্বাদ মিটিয়ে এঁটে ওই জীবনে
মীনের মতো ভাসে। মিনতি রানীর শুকনো শানকিতে
হাসে, দুখের দহন জ্বালা। মালা-
খুলে ফেলে সংসারের, আহ্ মাঝি। পা বাড়ালে নিরুদ্দেশে
ভরা বৈশাখ পাল ছিঁড়ে আসে চৌকাঠে
-'জোয়ার এনেছি মাঝি মরা পাঙে। পাল তোলো এইবার
বৈশাখ, বাজালো যে ঢাক। নতুন নৌকা বাঁধো এইবার
নতুন স্রোতে দুঃখ-ব্যথা যতো ভেসে যাক'
চৌকাঠ না মাড়িয়ে মাঝি, ঘরের কাঠেই তোলে নতুন দেহ
মাটির শিল্পরা তখন ডাকে- আয় মঙ্গল আয়
সরিয়ে জঞ্জাল যতো, লাখে লাখে।

আলোর মিছিল

নাসরীন খান

আমার যত আঁধারকাল
রং হয়ে যাক ভালোবাসার আভায়,
বেদনার পাথর সব যাক সরে বহুদূর
যা আমাকে অবচেতনে কাঁদায়।

খুশির বনে উতল হাওয়ার
গা ভেঁজাব বৃষ্টিতে,
মন নাচেরে ঘিনাক ঘিনাক
নতুন গানের সৃষ্টিতে।

আকাশ আমার বিশাল পাওয়া
নদী ছুটে কার পানে,
দিকবিদিকে খুশির জোয়ার
ভালোবাসায় মন টানে।

ঝড়ের লাগাম ধরে দাঁড়ের
রুখব আজ দুহাতে,
আলোর মিছিল ঝরাবে দীপ্তি
কোন এক সুপ্রভাতে।

বৈশাখে তাপদাহ

শাহান আরা জাকির

বৈশাখে তাপদাহ খরতাপ রোদ্দুরে
ঘোলাজলে
সোদা ঘ্রাণ আসে যেন মাটি ফুঁড়ে,
আম পাকা জাম পাকা আরো আছে ঝাকা নাকা
লিচুগাছে থোকা থোকা
লাল লাল ঘ্রাণমাখা,
ঝোলে আম গাছে গাছে টকটকে সিঁদুরে,
মনে হয় দুধে ভাতে খাই যেন পেটপুরে...
বোশেখের পাক্কা কাঁচামরিচ পেঁয়াজে
সাথে যদি থাকে ইলিশ জিভে রস আসে যে,
আকাশে কালো মেঘ বোশেখে কাল হয়
হুঙ্কারে ডঙ্কারে আমাদের হয় ভয়,
দাবানলে ঘরবাড়ি শত শত পুড়ে যায়
নিঃস্ব হয়ে যায় কত প্রাণ অসহায়,
তোলপাড় করে আসে
এই কালবৈশাখ
বিদ্যুৎ চমকায় ভয়ানক হাঁকডাক,
তবু এই বৈশাখে রমনায় হয় গান
নবরূপে চাঙ্গা হয়
আমাদের মনপ্রাণ...

বৈশাখী গান

সেলিনা হোসেন

রাত থেকেই অভিমান করে আছে ইকতি। সীমান কতো বুঝিয়েছে, কতো সোহাগ করেছে, কিন্তু কিছুতেই ইকতির গোঁ ভাঙাতে পারেনি, শক্ত শরীরটাকে কাছে টানতে পারেনি। তবুও মনে মনে আশা ছিলো সীমানের, ইকতি এলে আপনি ধরা দেবে। কিন্তু সকালবেলা যখন ঘুম ভেঙে দেখল ইকতি বিছানায় নেই, তখন সীমানের অভিমান হলো।

আজ চলে যাবে সীমান। ছুটিতে বাড়ি এসেছিলো। চাকরি করে রাজশাহীতে। ইদের সময় বছরের কয়েকটা দিন মাত্র ছুটি। এই কটা দিন তৃপ্তি হয় না ইকতির। তাই ভয়ানক রাগ। অথচ কোনো উপায় নেই সীমানের। সরকারি চাকরি। ঠিকমতো না গেলেও উপায় নেই। তাছাড়া কাল রাত থেকে ইকতি ধরেছে এবার সে রাজশাহী যাবেই যাবে। কারো কোনো কথা শুনবে না। অনেক বুঝিয়েছে সীমান। বাড়িতে মায়ের অসুখ। মাকে এই অবস্থায় একলা রেখে কি করে ইকতিকে নিয়ে রাজশাহী যায়? না এতখানি স্বার্থপর সে হতে পারে না। তার উপর যা মাইনা। এই বেতনে সংসার চালানো দায় হবে। তার চেয়ে এই তো ভালো আছে। ইকতি গ্রামে আছে আর সীমান তো বছরে দু'একবার করে আসছে। দেখাশোনা হচ্ছে। এই তো যথেষ্ট। কিন্তু তাতে তৃপ্ত নয় ইকতি। ওর ইচ্ছা সীমান সবসময় ওর কাছে থাকুক- ওর একটা ছোট্ট সংসার হোক- কয়েকটা ছেলেমেয়ে হোক। কিন্তু সীমান কেবল তাতে বাদ সাধে। বছরে পনেরো দিনের জন্য এসে- এই অল্প ক'দিনে ইকতির সেহমন কোনোটাই তৃপ্ত হয় না। তাই কাল রাত থেকেই চলছে অভিমানের পালা। সীমান লক্ষ্য করেছে, এই এক বছরের মধ্যে ইকতি অনেক সুন্দর হয়েছে। দেহের প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ভরে উঠেছে। মুখখানাতে অদ্ভুত লাবণ্য। আর পাকা ধানের শীষের মতো যৌবনটা যেন ফেটে পড়তে যাচ্ছে। সীমানেরও কি ইচ্ছা করে না ইকতিকে নিজের কাছে রাখতে, কিন্তু পারে কৈ? সীমানের মনটাও যেন কেমন হয়ে গেলো। এমন একটা ভরাট যৌবন সে উপভোগ করতে পারছে না।

অনেক খোঁজাখুঁজির পর পুকুরঘাটে ইকতিকে পাওয়া গেলো। কাচারিঘর থেকে আজানের সুর আসছে। চুপচাপ পানিতে পা ডুবিয়ে বসে আছে ইকতি। চোখ দুটো ছলছল করছে। সীমান যেয়ে পাশের খেজুরগাছের গুঁড়িটার উপর যখন বসল তখনও চোখ তুলে তাকালো না ইকতি। আস্তে করে ডাকলো, তাও সাড়া দিলো না ইকতি। সীমানেরও রাগ হলো। বললো, -যাইবার দিন এরম কল্যে কিন্তু ভালো হইবো না ইকতি। তাইলে আঁই আর দ্যাশেই আইতাম না।

-আইও না। তোরে কে হাদে নি আইতো বুলি।

ইকতি না তাকিয়েই বললো। উঠে এলো সীমান। অথচ এই মুহূর্তে পুকুরের পানির দিকে তাকিয়ে বড্ড রোমান্টিক হতে ইচ্ছে হচ্ছিলো সীমানের। কিন্তু ইকতির কাছ থেকে কোনো সাড়া না পেয়ে মনটা বিকল হয়ে গেল। বারান্দার খুঁটিতে হেলান দিয়ে উদাসভাবে বসে রইলো। বেঁচে থাকার সব স্বাদটাই যেন বিস্বাদ হয়ে গেল। পাশের ঘর থেকে মার কাশির শব্দ আসছে। দমকে দমকে কাশি উঠছে। অথচ এই মুহূর্তে মাকে ধরার কোনো ইচ্ছাই হলো না। ইকতি একদিন না পেরে বলেছিল, 'তোর মার সেবা করনের লাইনি আঁরে বিয়া কইচ্ছ? হেইডা হইলে তো ওপ্পা বান্দি রাইখলেই হাইত্যা'। সেদিন ভয়ানক বিব্রত বোধ করেছিল সীমান। কিছুই বলতে পারেনি। শুধু

তাকিয়েছিলো ইকতির দিকে। এমন কথা সে ইকতির মুখ থেকে আশা করেনি। কারণ ইকতি অতটা মুখরা নয়। কিন্তু সীমান দোষও দিতে পারেনি ইকতিকে। সত্যি সারাদিন মার সেবা, বাবাকে দেখাশুনা, আরোও ঝামেলায় একটুও সময় পায় না ইকতি। অথচ এই উঠতি বয়সে কি এতটা ঝামেলা ভালো লাগে! সবই বোঝে সীমান। অনুভূতি তো আর তার কম নেই। কিন্তু কি করবে কোনো উপায় নেই। নিশ্বাস বন্ধ হয়ে গেলেও এখানে থাকতে হবে ইকতিকে। একটু থেমে মা আবার কাশতে শুরু করছেন। সীমানের মনে হলো, 'বুড়ি যে মরে না ক্যান?' সেই মুহূর্তে ভেজা কাপড়ে একরাশ চুল এলিয়ে দিয়ে সপসপ করতে করতে ইকতি এসে দাঁড়ালো উঠোনে। কর্সা দেহের সঙ্গে ভেজা পাতলা কাপড়টা একাকার হয়ে একটা অদ্ভুত জগতের সৃষ্টি হয়েছে ইকতির দেহে। সীমান চোখ ফেরাতে পারলো না।

একটু একটু বেলা এগিয়ে আসছে। চঞ্চল হয় সীমান আরো। খানিকক্ষণ পর তাকে চলে যেতে হবে। বারোটায় ট্রেন। দশটায় বের হতে হবে বাড়ি থেকে। মনটাকে কিছুতে বাগে আনতে পারছে না সীমান। ইকতির এই রূপ-সমৃদ্ধ দেহটা ছেড়ে যেতে যেন ভরসা হচ্ছে না সীমানের। পাড়া-গাঁ বড্ডো খারাপ জায়গা। এই মুহূর্তে ইকতির উপর আর কোনো রাগ করতে পারছে না সীমান। ইকতি তো এক মুহূর্ত এখানে থাকতে চায় না। তার সঙ্গে রাজশাহী যাবার জন্য বেচারির কি আকুলতা। অথচ কোনো পথই খুঁজে পায় না সীমান। সত্যি বিয়ে করার পর থেকে এতটুকু মূল্য দিয়েছে সে ইকতিকে? বিয়ে করার আগে নিজের প্রয়োজনের চাইতে সংসারের প্রয়োজনের দিকে তাকিয়েই বিয়ে করেছিলো সীমান। মা অসুস্থ। উঠতে পারে না। সংসারটা কে দেখে? কাজেই বিয়ে করে একটা বৌ এনে বাড়িতে ফেলে রাখো। নিজের উপরই রাগ হলো সীমানের। এই চার বছরের মধ্যে ইকতির কোনো দাবিই সে পূরণ করতে পারেনি। অথচ গা থেকে বাসরের গন্ধটা না যেতেই সংসারের যোয়াল দুটো কাঁধে তুলে নিতে হয়েছে ইকতিকে। এই চার বছরে ইকতি তিলতিল করে অনুভব করেছে সীমানের চাইতে সংসারের কাছেই তার প্রয়োজন বেশি। সীমান বছরে কটা দিনই বা তার বাড়িতে থাকে।

নিজেকে বিশ্লেষণ করলো ইকতি। গতরাত থেকে শুরু করে আজ সকালের ব্যবহারের কথা মনে হলো তার। মনে মনে লজ্জিত হলো। সত্যি সীমান ভয়ানক রাগ করেছে। ইকতি নিজেও বুঝতে পারলো, সংসারটাকে এই অবস্থায় রেখে সে নিজেও রাজশাহী যেতে পারে না। গাঁয়ে একটা টি টি পড়ে যাবে। তার উপর মার যা কষ্ট। এ সমস্ত চোখে দেখেও মাকে একলা ফেলে যায় কি করে ইকতি? আস্তে আস্তে ভিজে কাপড়ের মতোই মনটা তার নরম হয়ে এলো। সীমান তখন গাঁয়ের অন্য সবার সঙ্গে দেখা করবার জন্য বেরোচ্ছিলো। ইকতি পথ আটকালো।

-কোনাই যাও?

-তোর হুনি দরকার কি? সীমানের ঝাঁজ এখনও কমেনি।

ইকতি সামনে এসে দাঁড়ালো। পথ আটকালো সীমানের। দু'চোখে বিদ্যুতের ঝিলিক হেনে বললো, না আর যাইতে হাইত্যা ন। আইও। হাতে ধরে টানতে টানতে নিয়ে এলো সীমানকে। সীমান অনুভব করলো ইকতির গায়েও কম জোর নেই। যদিও ইকতির এই জোর জবর-দস্তি ভয়ানক মধুর লাগছিলো সীমানের। ইকতি ওকে চৌকির উপর বসিয়ে দিলো। নিজেও বসলো পাশে। বুকের মধ্যে বারবার হাতটা ঘষলো।

-রাগ কইচ্ছনি?

-না। সীমান চুপচাপ বসে রইলো। ও চাইছিলো ইকতি আগে ওর কাছে আত্মসমর্পণ করুক। সীমান কিছুতেই আগে ধরা দেবে না।

-তই কথা কও না ক্যান? ইকতি আরো ঘেঁষে বসলো। মিশে যেতে চাইলো সীমানের শরীরে।

-সত্যি কইতিছি আঁই আর রাজশাহী যাওয়ার কথা কইতাম ন? আর একদিনও কইতাম ন। সীমানের বুকে মুখ গুঁজে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো ইকতি। আর শক্ত হয়ে বসে থাকা সীমানের পক্ষে সম্ভব হলো না। ইকতিকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরে ওর ভেজা চুলের মধ্যে মুখ গুঁজে দিলো। ওকে সান্ত্বনা দেয়ার জন্য বললো, 'তুই কাঁদিছ না ইকতি। সামনের বছর আইতে বাসা ঠিক করি আইয়ুম। এইবার তোরে লই যাইয়ুম এ যাইয়ুম।'

এ কথাগুলো বহুবার শুনেছে ইকতি। তবুও আজ আবার নতুন করে শুনতে ভালো লাগলো ওর। এই নিয়েই তো বেঁচে আছে ও। নইলে এতদিন কোনদিকে কোনদিকে ভেসে যেতো। আজ যেন সব কথাগুলো বেসুরা লাগছে ইকতির কাছে। আস্তে আস্তে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে চলে গেলো রান্নাঘরে।

বেলা তখন অনেক। মরিচ পুড়িয়ে পেঁয়াজ দিয়ে পান্তাভাত খেয়ে যখন পথে নামলো তখন নিজেকে খুব ঝরঝরে মনে হলো সীমানের। চাড়াবাড়ির শেষমাথা পর্যন্ত ইকতি ওর সঙ্গে এলো। আর আসবে না ইকতি। সামনেই খাল। সুপারির সাঁকো পেরিয়ে চলে এলো সীমান। পেছনে তাকালো। তখনও দাঁড়িয়ে আছে ইকতি। ইকতি হাসলো। তারপর মাসকলাই ক্ষেতের পাশ দিয়ে এগুতে লাগলো সীমান। দু'মাইল রাস্তা হাঁটতে হবে। স্টেশনের এখনও অনেক বাকি।

ইকতি ফিরলো। চাড়াবাড়ির মাঝামাঝি যেতেই সাজনের সঙ্গে দেখা। মসজিদের ইমামের ছেলে সাজন। দা আর দড়ি নিয়ে সুপারি কাটতে যাচ্ছে। ইকতিকে দেখে শিস বাজালো। ইকতি থমকে দাঁড়ালো। সারা রাস্তাটা জুড়ে দু'হাত প্রসারিত করে দাঁড়িয়ে আছে সাজন। মিটিমিটি হাসছে। ইকতির গা জ্বলে উঠলো। অথচ পাশ কাটিয়ে যাবার উপায় নেই। একপাশে বেতের ঝোপ অন্যপাশে বিরাট একটা আমের গুঁড়ি পড়ে আছে।

-সীমান চলি গেছে নি?

-হ গেছে। ইকতি মুখ ঝামটা দিলো।

-যাক এতক্ষণে আঁর ধড়ে হ্রাণ আইলো।

-কেয়া? ইকতি চোখ তুললো।

-হিগা থাকলে তোঁর দেয়াই তো হাশুন যায় না।

ইকতি একটু রোমাঞ্চিত হলো। সাজনের সবটুকু দৃষ্টি তখন ইকতির মাথা থেকে পায়ের মধ্যে বিচরণ করছে।

-হ ছাড়। ঘরে মা একলা রইছে। আঁরে না দেইখলে টোপাইবো।

-না ছাইড়তাম ন। সাজন তখনও হাসছে।

-ভালো হইতো না কিন্তু।

ইকতি রেগে উঠলো। পথ ছেড়ে দিলো সাজন। সাজনের জোয়ান দেহটা পেছনে ফেলে

এগিয়ে এলো ইকতি। সাজন তখনও দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শিস বাজাচ্ছিলো।

ছয়মাস পার হয়ে গেছে। সীমান নিয়মিত চিঠি দেয় কিন্তু ইদানিং ইকতির যেন কি হয়েছে। সীমানের চিঠির জন্য আর ব্যাকুল হয় না। চিঠি দিতে দেরি হলে পাল্টা অনুযোগ করে চিঠি দেয় না সীমানকে। ঐ চিঠির চাইতে অনেক বেশি আকর্ষণ খুঁজে পায় সাজনের সেই অদ্ভুত শিস বাজানোর ভঙ্গিতে। মাঝে মাঝে ইকতি অবাক হয়। সেই ছেলেটা যে তাকে খুব জ্বালাতো আর ও বিরক্ত হয়ে রেগে উঠতো সেই সাজন এখন ইকতির সবটুকু অধিকার করে বসে আছে। পুকুরের ঘাটে ঘরের পেছনের পেয়ারা গাছটার নিচে, চাড়াবাড়ির সুপারি গাছের সারির আড়ালে ইকতি আজকাল নতুন অর্থ খুঁজে পায়। বাড়িতে বাবা প্রায়ই থাকে না, অসুস্থ মা বিছানা থেকে ওঠে না সারাদিন ইকতির কাটে কি করে? সাজনের দুর্বার আকর্ষণে পড়তে তাই খুব বেশি বেগ পেতে হয়নি ইকতিকে। সীমানের সঙ্গে ও মিলিত হয় বছরে পনেরো থেকে কুড়ি দিনের মতো। নিদেনপক্ষে একমাস। তারপর? নিজেকে এমনিভাবে বিশ্লেষণ করে নিজের কোনো দোষ খুঁজে পায় না ইকতি। সাজন বলেছিলো, 'জীবনের এমন ভরদুপুরে যৌবনডা তুঁই খোয়াও কেয়া ইকতি।' ইকতি চমকে উঠেছিল। ঘরে যেয়ে নিজেকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে অনেকক্ষণ দেখলো। সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত দেহ জুড়ে শিরশির করে উঠলো সেই অনুভূতিটা যা সীমান দিয়ে গেছে কতোদিনের জন্য- তার রেশ এখনও তার সব জায়গা জুড়ে। কিক করে হাসে ইকতি। সাজন ঠিকই বলে। সাজন, সাজন, সাজন, -নামের মধ্যে একটা ঝঙ্কার আছে। ঐ জোয়ান তাগড়া শরীরের ঝাঁকুনিতেও একটা মাদকতা আছে। কতোদিন সাজন ওকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরেছে- কতো আদর করেছে ঠোঁটে, গালে, মাথায়। খুব একটা খারাপ লাগতো না ইকতির। শরীরটা কেমন ঝাঁকুনি দিয়ে থেমে যেতো তাইতেই বড়ো আনন্দ ওর। মাঝে মাঝে ও যখন একটা অজানিত আশঙ্কায় শিউরে উঠতো তখন সাজন বলতো, 'তোর এইসব শখ আছে সেইয়ে তো তুঁই মানুষ। আর মাইয়া মানুষের এরূপ শখ একটু বেশিই যায়।' সাজনকে নিবৃত্ত করা ইকতির পক্ষে সম্ভব নয়। লোকটা যেমন কাজে পটু- তেমনি কথা বলতেও ওস্তাদ।

একদিন রাতের অন্ধকারে একলা বিছানায় ইকতি নিজেকে আবিষ্কার করলো নতুন উপলব্ধির একটা ঠাণ্ডা স্তব্ধতায়। সব অনুভূতিগুলো তার একজায়গায় জড়ো হয়ে কাঁপতে শুরু করলো। দেহে তার নবজীবনের বারতা। ইকতি অনুভব করলো জীবনের মোড় ঘুরতে শুরু করেছে। ভয় নয়, আশঙ্কা নয়, ঘৃণা নয় সবকিছু মিলিয়ে একমুঠিতে দলা পাকানো কাপড়ের টুকরোর মতো কুঁকড়ে রইলো ইকতি। রাত কাটলো। সকাল হলো। কিন্তু তবু যেন ভোর হলো না ইকতির ঘরের দুয়ারে। সমস্ত শরীরটা ভার হয়ে আছে। উঠবার ইচ্ছা একটুও নেই। মনে হচ্ছে অনন্তকাল ধরে এমন করে শুয়ে থাকতে পারলেই বুঝি ভালো হতো। বাইরে হাঁসমুরগিগুলো চেঁচাচ্ছে- গরু দুটো ডাকতে ডাকতে সারা- মার কাশির শব্দটা কানে আসছে- বাবা কোরান শরিফ পড়ছেন। একটু পরেই খাবার চাইবেন। ইকতি বুঝতে পারলো সমস্ত সংসারটা ওর দিকে তাকিয়ে আছে। ও না উঠলে এ সংসারের দিন এগুবে না। ওর দায়িত্ব অনেক। সমস্ত শক্তিটুকু জড়ো করে উঠলো ইকতি। সারাদিন আচ্ছন্নের মতো কাজ করলো ইকতি। কারো সঙ্গে বেশি কথা বললো না। পুকুরঘাটে একবার সাজনের সঙ্গে দেখা হয়েছিলো। সাজন হেসেছিলো, কথা বলেছিলো কিন্তু সাড়া দেয়নি ইকতি। বারবার যেন ইকতি অনুভব করছে সমস্ত পৃথিবীটা ওর দিকে তাকিয়ে আছে। তাকিয়ে আছে সেখানে যেখানে একটা সজীব প্রাণের লক্ষণ দানা বেঁধে উঠেছে। কখনও ইকতির ভয় হচ্ছে কখনও একরাশ মমতা হচ্ছে। কিন্তু ঠিক ঘৃণা হচ্ছে না। ইকতি আশ্চর্য হলো নিজেকে সে ঘৃণা করতে পারছে না এমন কি সাজনকেও না। এ ছয়মাসের মধ্যে ও কি একবারও বুঝতে পারেনি এমন একটা কিছু ঘটতে পারে! তবে আর ভয় কেন। সন্ধ্যা হলো। শাশুড়ি নামাজ পড়ছেন। শ্বশুর গেছেন মসজিদে। ইকতি চেরাগ জ্বালালো। চৌকাঠের উপর চোরাগটা রেখে নিঃশব্দে বেরিয়ে এলো ঘর থেকে। বেশিদূর নয় কয়েক পা গেলেই কামরাঙা গাছটার ওপাশে হাফেজ চাচার ঘর। নিশ্চয় সাজন ঘরেই আছে। হ্যাঁ ঐতো দেখা যাচ্ছে। ইশারায় সাজনকে ডেকে একেবারে এসে উপস্থিত হলো বড়ো আমগাছটার নিচে। যেখানে অন্ধকার বেশ ঘন হয়ে উঠেছে। ইকতি সাজনের হাত বেশ শক্ত করে ধরে রইলো। খুলে বললো সব কথা। চুপচাপ শুনে গেল সাজন। আজ ও উচ্ছ্বাসিত হয়ে ওঠেনি। ইকতিকে দেখামাত্র বুকে নেবার জন্যে আকুল হয়নি। ভয়ে আর লজ্জায় কোনো চেতনাই নেই সাজনের। যে সাজন ইকতিকে বহুবার বলেছে, 'তুই ডরাস কিয়ের লাই ইকতি। এই দুনিয়াদারি শুধু ভোগের খেলা। যে যতো হার হ্যাত ভরি খাই লও।' আজ সাজনের মুখে কথা নেই। ইকতি এখনও হাত ছাড়েনি। সাজন বললো, অন কি হইবো?

ইকতি বুঝলো সাজনের গলাটা কাঁপছে।

-আঁর কি হইবো। মাইনে হুইনবো আঁর হোলার বাপ সীমান ন সাজন।

-ইকতি, আঁরে তুঁই বাঁচা।

শুরু হলো অনুনয়ের পালা। ইকতি চমকিত হলো। একেবারে অভিনব। ও ভেবেছিল সাজন বুঝি সবকিছু খুব হালকাভাবে নিয়ে ইকতিকে একটা সান্ত্বনা দেবে। অন্তত এ অনুনয়টা সে একেবারে আশা করেনি। যে সাজন যৌবনটা ভোগ করার জন্য লালায়িত তার পরিণতি তাকে এমন ব্যাকুল করে কেন? ইকতির রাগ হলো। কোনো কথা বললো না। সাজন আবার শুরু করলো,

-তুঁই জানছ আঁর বাপজান মসজিদের ইমাম। মাইনে জাইনলে হ্যাতার হিছে আর কেউ নামাজ পড়তে খাড়াইত ন। তুই যা চাহ আঁই তোরে তাই দিমুম। তুঁই আঁরে বাঁচা।

সাজনের হাতটা ইকতি কখন ছেড়ে দিয়েছে নিজেও জানে না। সাজনের কাপুরুষতা ইকতিকে নীরব করে দিলো। ইকতি সামনে দেখতে পেল শুধু অকূল অন্ধকার। সেখানে তাকে শুধু একাই সংগ্রাম করতে হবে। সাজন আবার বললো, ছাতনের মা এগুলা হালাইত ভালো ওযুদ জানে।

-না।

এতক্ষণ পর ইকতি কথা বললো। কথা তো নয় যেন হুঙ্কার। সাজন চমকে উঠলো। ইকতি তা দেখতে পেলো না। যাকে সে ধারণ

করেছে তাকে সে বিনষ্ট করতে পারবে না। সাজনের মতো ইকতি জীবনটাকে শুধু মুখের কথায় ভালোবাসে না। ভালোবাসে কাজের মাঝে, ভালোবাসে অস্তিত্বের মাঝে। জীবনের বিলীন হলে জীবনকে ভালোবাসার সুযোগ কই। সাজনের কাপুরুষতায় প্রচণ্ড ঘা খেল ইকতি। শুধু বললো, আঁই কী কইল্যে তুঁই বাঁচবা হেইডা কও।

-তুই আঁর নাম কারো কাছে কইহ না।

-বেশ হেইডায়ে হইবো।

যে ভার বইতে অক্ষম তাকে দায়িত্ব দেবার মতো রুচি ইকতির নেই। অন্তত যার দায়িত্ব সবই সে পালন করে চলেছে তার সমগ্র চেতনা সমৃদ্ধ অস্তিত্বের মাঝে। আমগাছের অন্ধকারকে পেছনে ফেলে চলে এলো ইকতি। সাজনকে অনুরোধ করলো না, উপরোধ করলো না, একবার কাঁদলোও না। নিজের কৃতকর্মের জন্য অনুশোচনাও করলো না, এমনকি ভাগ্যটাকেও দোষারোপ করলো না। দেখে অবাক হয়েছিলো সাজন। আমগাছের অন্ধকারে একা একা দাঁড়িয়ে অনুভব করলো, ইকতির কাছে ও আজ হেরে গেছে।

যেদিন জানাজানি হলো সেদিন থেকে শাশুড়ি ওর হাতের ছোঁয়া পানি পর্যন্ত খেতে রাজি হলেন না। শ্বশুর হাঁ-না কিছুই বললেন না। এসবের জন্য তো ইকতি তৈরি হয়েই আছে। ভয় আর কাকে? শুধু নিজেকে ভয়, কোনো মুহূর্তে যদি নিজের শক্তি হারিয়ে ফেলে? আস্তে আস্তে এ-কান ও-কান, ফিসফিস, গুনগুন থেকে শুরু করে সমগ্র পাড়ায় রটে গেলো ইকতির কীর্তির কথা। মসজিদের ইমাম ছুটে এলেন ওর শ্বশুরের কাছে। যা-তা বললেন। এমন নষ্টা মেয়েলোক নিয়ে যে ওর শ্বশুর এ পাড়ায় বাস করবে তা তো হবে না। হয় ওকে বাড়ি ছাড়তে হবে। নইলে সব কথা প্রকাশ করে সমাজের কাছে মাপ চাইতে হবে। সবার রাগ ঐ একটি জায়গায়। ইকতি একেবারে নিশ্চুপ। কোনো কথাই প্রকাশ করছে না। যাবার সময় ইমাম সাহেব গালিগালাজ করলেন, 'নষ্টা খানকি মাগী। এরুম মাইয়া এ হাড়ায় থাইলে হাড়া আর ভালা থাকবো না। হারামজাদীরে অন্যত্র দূর করন লাইগবো।'

কেঁপে উঠলো ইকতি। যে মুখে কোরানের আয়াতগুলো এত সুন্দর হয়ে বের হয় সে মুখ কতো জঘন্য। যেন একটা দুর্গন্ধ বের হয়ে আসছে। ইকতি রান্নাঘরে শাপলা ভাজছিলো। উঠোনে ইমাম সাহেবের কথা শুনে বেরিয়ে এলো। আগুনের আঁচে করসা মুখটা টকটক করছিলো। সমস্ত শরীরে একটা ঋজু ভঙ্গি। ইমামের দৃষ্টিটা থমকে গেলো। সহজ ভঙ্গিতে বললো, আপনে আঁরে গালমন্দ করেন কিয়ের লাই? আঁই আপনের কি কইছি? নিজের মাইওলারে হামলান গোই। অন্যের ভালো করন লাইগদ ন।

ইকতি গট্‌গট্ করে আবার রান্নাঘরে ঢুকলো। কড়াইটা চাপিয়ে দিলো উনুনে। শাপলা ভাজি খাওয়ার তার ভারী সাধ।

ইমাম সাহেব হতবাক। ওর শ্বশুরও একটু বিব্রত। যদিও এ ক'দিন উনি ইকতিকে ভালোমন্দ একটা কথাও বলেননি। নীরব দর্শকের ভূমিকা নিয়েছেন। ও ঘর থেকে শাশুড়ি নিজের ভাগ্যকে দোষারোপ করে কেঁদে আকুল হচ্ছে। এমন মেয়েকে যে মা পেটে ধরেছিলো তাকে অভিশাপ দিতেও কুণ্ঠিত হচ্ছে না। ইমাম সাহেব গড়গড় করে উঠলেন। যাবার আগে বলে গেলেন এই অপমানের প্রতিশোধ নেবেন। অন্যায় করেছে কোথায় চুপ করে থাকবে তা নয়, যতোবড়ো কথা!

সীমানের মায়ের খারাপ অবস্থা জানিয়ে টেলিগ্রাম করা হয়েছে। দু'একদিনের মধ্যে এসে পড়বে। সাজনের দেখা নাই অনেকদিন। চোরের মতো পালিয়ে বেড়ায় সে। মার মুখে শুনেছিলো একদিন, 'মাইয়ার এরুম সাহস কে এরুম কইরলো হেই হোলাগার নাম হইব্যক্ত কয় না।' শুনে নিশ্বাস আটকে আসছিলো সাজনের। ইকতির এই করুণা, এই উদারতা নাকি ঘৃণা যাই হোক সাজন আর সহ্য করতে পারছে না। যেদিন বাবাকে অপমান করেছে সেদিন যেন একটু শান্তি পেয়েছিলো সাজন। মনে হয়েছিলো ইকতি আরো অপমান করুক। সবাইকে করুক। আর তার ঢেউ এসে লাগুক সাজনের গায়ে। নইলে ইকতির এ নীরবতা অসহ্য। মাঝে মাঝে মনে হয় সাজন প্রকাশ করে দেবে সব কথা। কিন্তু পরক্ষণে পিছিয়ে আসে ভয়ে। না এতো সাহস সাজনের নেই। অথচ ইকতি কতো সহজে দুর্বার হয়ে উঠেছে। নিজেকে বাঁচানোর প্রয়াসের অন্ত নেই তার। আর ওর এই দৃপ্ত ভঙ্গিটুকু সবচেয়ে বেশি মুগ্ধ করেছে সাজনকে। অথচ কতোদিন ইকতির দেহটাকে নেড়েচেড়ে দেখেছে ও, কিন্তু না কোথাও এমন ভঙ্গি সে খুঁজে পায়নি। কিন্তু ইকতি আজ অভিনব।

আজ বিচার হবে ইকতির। উদ্যোক্তা ইমাম সাহেব। ইতিমধ্যেই জনমত ক্ষেপিয়ে তুলেছেন। এতোবড়ো অন্যায়, তার উপর ইমাম সাহেবকে অপমান করেছে। সে মেয়ে সবার নাকের ডগার উপর ঘুরে বেড়াবে এ কেউ বরদাশত করতে রাজি নয়। ইকতি ভেতরে ভেতরে নিজেকে শক্ত করলো। সীমান আজ আসতে পারে। শ্বশুর কোনো পক্ষেই নাই। আর শাশুড়ি তার বিপক্ষে। সুতরাং বিচারে তাকে উপস্থিত হতেই হবে। নইলে গাঁয়ের লোক তাকে ছাড়বে না। অথচ বিচারে উপস্থিত হবার ইচ্ছা তার একদম নেই। এ সময় সীমান থাকলে হতো। কিন্তু থাকলেও কি হতো বলা যায় না। সীমানকেও তার ভরসা হয় না। যেদিকে তাকায় ইকতি উপলব্ধি করে সে শুধু একা- তার চারপাশে কেউ নেই। দুপুরে জামাতের পর বিচার। শ্বশুর সকালবেলা গঞ্জের হাটে চলে গেলো। ইকতি বুঝলো সবকিছুই। রাতের আগে আর ফিরবে না। ইকতি নিজের সবটুকু শক্তি সঞ্চয় করে রাখলো। না, সে কোনোমতেই পিছু হটবে না। সে কি অন্যায় করেছে? পেটের মধ্যে একটা সজীব নিষ্কলঙ্ক প্রাণের অস্তিত্ব যদি এতোই অবাঞ্ছিত হয়, তবে তো মানুষের জন্মের মধ্যে কোথাও সত্য আছে বলে মনে হয় না। প্রতিটি মানুষের জন্মই পাপে ভরা। ইকতি মনে মনে তৈরি হলো। দেহের দাবি মেটানোটা যদি পাপ হয় তবে তো এ পৃথিবীর একটি লোকেরও পুণ্য সঞ্চয় হয়নি।

মসজিদের সামনে লোকে ভেঙে পড়েছে। ইকতি যে গাঁয়ের মধ্যে একটা উত্তেজনার সৃষ্টি করেছে তা এই সভার দিকে তাকালেই বোঝা যায়। কেউ চাপা হাসিতে উদ্ভাসিত, কেউ উত্তেজিত, আর কেউ কেউ শুধু নীরব দর্শকের ভূমিকায় স্থান নিয়েছে। পাড়ার মেয়েরা ইকতিকে নিয়ে এলো। সভায় একটা গুঞ্জন উঠলো। ইকতি নির্বিকার, মুখখানা ভাবলেশহীন। যেন আজ সবকিছুকে উপেক্ষা করবার মন্ত্র পেয়েছে ও। ঘোমটা টেনে একপাশে বসলো। একবার দৃষ্টি বুলালো চারদিকে।

পরিচিত মুখ বহু। কিন্তু এই সভায় কেউ তার নয়। দৃষ্টিটা ঘুরতে ঘুরতে ইমাম সাহেবের পাশে এসে থেমে গেলো। ইমাম সাহেব গলা ঝেড়ে তৈরি হলেন। সকলে উৎসুক। সাজনও নির্বিকার। দু'একবার আড়চোখে ইকতিকে দেখেছে। সেই ভাবলেশহীন উদ্ধত ভঙ্গি একটুও ভালো লাগেনি ওর। ওর মনে হচ্ছিলো ইকতি সঙ্কুচিত হোক, লজ্জিত হোক। আর এই সভার মধ্যে ওর হয়ে বাবার কাছে ক্ষমা চেয়ে একটু মহত্ত দেখাবে। কিন্তু ও তো জানতো ইকতি নত হবে না বলেই পণ করেছে।

সভার দিকে তাকিয়ে ইমাম সাহেব শুরু করলেন,

-ভাইসব, এই নষ্টা, ছিনালি মাগী...

ভিড়ের মধ্যে কে যেন প্রতিবাদ তুললো, 'ভালো করি কতা কন ইমাম সাব। গালিমন্দ করেন কিয়ের লই?

ইকতি যেন একটু জোর পেল। ইমাম সাহেব একটা রোষদৃষ্টি হেনে আবার শুরু করলেন, 'এই মাগীরে আজ কওন লাইগবো হিগার হোলার বাপ কে? গাঁয়ের মধ্যে এরম শয়তান আমরা রাখতে পারি না। সারা-গাঁ অপবিত্র হইবো।'

ইমাম সাহেব ইকতির দিকে গর্জন করলেন, 'এ্যাই মাগী ক তোর হোলার বাপ কে? হেরপর আমরা ইগারেই মাথায় চুলকানি দিতে বার করি দিমুম।'

ইকতি নীরব। সাজন একমনে তসবি জপছে। ইমাম সাহেব গর্জন করলেন। একবার, দুবার, তিনবার। এবার ইকতি ঝট করে উঠে দাঁড়ালো, 'তার আগে কন আপনের বাপ কে? আপনে যে কাজেম মিয়ার হোলা হেইডা আপনে কেমনে জাইনলেন? কাজেম মিয়ায়ে যে আপনের বাপ তার হুরমান কি?

ঘোমটা টেনে বসে পড়লো ইকতি। সভার মধ্যে গুঞ্জন উঠলো। দুষ্টু ছেলেরা হো হো করে হেসে উঠলো। কেউ কেউ লজ্জা পেলো। বৃদ্ধরাও লজ্জিত হলো। কেউ কেউ ছিঃ ছিঃ করলো। শরমভরম বলতে কিছুই নেই। সাজন বিস্মিত।

ইমাম সাহেব অপমানিত। এতগুলো লোকের সামনে তার বাপ নিয়ে সংশয়? ভেতরের আক্রোশটাকে কমিয়ে তিনি এ-সমস্ত বেহায়াপনার উপর দীর্ঘ বক্তৃতা জুড়ে দিলেন। লোকে যারা মজা দেখতে এসেছিলো তারা বিরক্ত হলো। কেউ কেউ উঠে চলে গেলো। ইমাম সাহেব আবার শুরু করলেন, 'হে যদি কোনো কতায় মা কয় তার একটা বিহিত আজ করেন লাইগবো। কি কন আপনেরা?'

-ঠিক। ঠিক। কেউ কেউ চিৎকার করলো। ইকতির ভাবলেশহীন মুখের দিকে তাকিয়ে বিস্ময়ের শেষ নেই কারো!

-এই মাগী হুন, তুই যে হাপ কইচ্ছত...

ইমাম সাহেবকে থামিয়ে দিলো ইকতি।

-না। আঁই কোনো হাপ করি ন। আঁই যদি হাপ করি থাই তাইলে ঘরে ঘরে ব্যাকেই হাপ করে। আপনেও কম করেন ন।

লজ্জায় অপমানে ইমাম সাহেবের মুখটা কালো হয়ে উঠলো। কোনো মতেই ইকতিকে কাবু করা যাচ্ছে না। সাজন ভয়ানক উত্তেজিত। প্রকাশ্য সভায় বাবার অপমান। কিন্তু এ মেয়েকে ঠাণ্ডা করা যায় কিভাবে। এ যদি শান্ত হতো, লজ্জিত হতো তাহলে মনের ঝাল মিটিয়ে বকা যেতো। কিন্তু ইকতি যেমন মুখরা হয়েছে তাতে কথাগুলো চড় হয়ে নিজের গালেই ফিরে আসছে। সাজন নীরব হয়ে রইলো।

সভায় আবার গুঞ্জন উঠলো। কি ব্যাপার? না সীমান আসছে। ইকতির সমস্ত শরীরটা দুলে উঠলো। এতক্ষণে ও নিজেকে ভয়ানক দুর্বল মনে করলো। ছোট্ট টিনের সুটকেসটা হাতে নিয়ে ও সোজা সভায় চলে এলো। চোখেমুখে জিজ্ঞাসা। ইমাম সাহেব ডেকে নিজের পাশে বসালেন। সব কথা খুলে বললেন। এতক্ষণে ইকতিকে দেখলো সীমান। মুখ নিচু করে ঘোমটা টেনে মাটির দিকে চেয়ে বসে আছে। মুখটা দেখতে পেল না সীমান। আরো দেখতে পেল না সেই দর্পিত, দৃপ্তভঙ্গিতে বাজময় ইকতির ঋজু দেহটা। ইকতি যেন এখন একটা কাপড়ের পুঁটলি।

ইমাম সাহেবের সব কথা শান্ত হয়ে শুনলো সীমান। মনে মনে ভাবলো, এ এক তরফা- ইকতির দিকটা শোনা হয়নি। হতচকিত সীমান কিছুই ভাবতে পারছে না। এ সত্যটাই মনে হচ্ছে ইকতিকে যে অবস্থায় রেখে গিয়েছিলো সেই অবস্থায় ইকতি আর নেই। সীমানের মনে পড়লো, ভাদ্রের ভরা নদীর মতো ইকতি আর নেই। এই যৌবন নিয়ে ও নির্বিবাদে চার বছর ঘর করেছে। আজ যদি ও একটা ভুল করে তার কি ক্ষমা নাই? নিশ্চয় আছে। সীমান কি জানে না জৈবিক অনুভূতিটা একান্তই স্বাভাবিক ব্যাপার। না ইকতির দোষ নেই। দোষ তার। ইকতি তো চেয়েই ছিলো ওর কাছে থাকতে। সেই তো ওর দাবি মেটাতে পারেনি। আজ সবার সামনে ইকতির এমন উলঙ্গ অবস্থা দেখে আহত হলো সীমান। ইকতির কাছে সে কোনোক্রমেই ছোট হতে পারবে না। ইমাম সাহেব সীমানের মুখের দিকে তাকিয়ে আছে কি বলে শোনার জন্য। সমস্ত সভার লোক নিশ্চুপ। সীমান কথা বললো, আপনেরা হেরে ইয়ানে আইনছেন কিয়ের লাই? হে যদি কোনো দোষ করে তার শাস্তি আঁই দিউম!

আপনেরা কে?

সভার লোক আবার চঞ্চল হলো। ইমাম সাহেব বিস্মিত। সাজন হতবাক। সবাই ভেবেছিলো সীমান এই মুহূর্তে ওকে তালাক দিয়ে দেবে। ইকতির মুখ থেকে ঘোমটা সরে গেছে। ইমাম সাহেব বললেন, তুঁই কি এই মাইয়া লই ঘর কইরবা?

-কিয়ের লাই কইতাম ন। হে আঁর বিয়া করা বউ।

-কিন্তু হের হ্যাডে কার হোলা, হেই খোঁজটাও লইবা না?

-দরকার নাই। হের হ্যাডে বার হোলাই থাক, হে মাইনষের হোলা। পরর হোলা ন!

ইকতির মাথা থেকে ঘোমটাটা খুলে গেছে। সীমান দেখলো কি অপূর্ব দেখাচ্ছে ইকতির মুখটা!

দেহের প্রতিটি ভাঁজ যেন আজ পরিপূর্ণতার আনন্দে নিমগ্ন। পরমুহূর্তে চৈতন্য হারিয়ে লুটিয়ে পড়লো ইকতি। সীমান সযত্নে তাকে বুকে তুলে নিলো।

সমস্ত সভা জুড়ে একটা কথাই ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরতে লাগলো, ও মানুষের সন্তান- ও মানুষের সন্তান- ও মানুষের সন্তান।

কারো মুখে কোনো কথা নেই। শুধু ইমাম সাহেব একরাশ থুথু ফেলে এ অপবিত্র স্থান ত্যাগ করলেন।

লেখক: কথাসাহিত্যিক

নামটি তোমার বোশেখ

কল্পনা সরকার

যত পুরোনো কষ্ট গ্লানি জরা-খরা
অগোচরে দূরে সরিয়ে
সুচি শুভ্ররাগে গন্ধরাজের চিত্তে
এসে দাঁড়ালে মর্তে,
ঠিক বাংলার দ্বারে!
নামটি তোমার বোশেখ।
নরম জমিনে মমতার শ্যামলতায় গাঁথা
লকলকে কচি লাউয়ের ডগার মত প্রাণছোঁয়া,
আবার হলুদ বসনে জড়ানো চন্দ্র শোভালতা।
নামটি তোমার বোশেখ।
মেঘের দেশের মেঘালয়ে মেঘ মেঘের অতিথি
আমন্ত্রণের সুর বাজে যার
নামটি তোমার বোশেখ।
রকমারি মেলা, নাগরদোলা খেলাপাতির খেলা,
শরমে মরমে বনভোজনে মাতামাতি
পুরোনো লেনদেন মিটিয়ে
তুলে ধর নবায়নের পাতা,
নামটি তোমার বোশেখ।
শস্যক্ষেতের আল ধ'রে আবার বনপথের ধারে
মুক্তপ্রাণে বাঙালি হাঁটে মাতায় দিয়ে ছাতা,
হঠাৎ মরাডাল ভেঙে পড়ে কিংবা আম্র গাছ যে ঝরার সে ঝরে
আম কুড়োনোয় মত্ত পাড়া
নামটি তোমার বোশেখ।
মুখরিত ধরিত্রীর অস্থিমজ্জায় মিলেমিশে বাঙালি সত্তায়
দাও নবীনতার দীক্ষা-মানব শিক্ষা,
কর ভ্রূক্ষেপ- যেখানে নেই নিষ্ফল বিলাপ আক্ষেপ, নয় কোন সন্তাপ
নক্ষত্রের বিশাখা থেকে নামটি নিয়ে বোশেখ।

স্মৃতিপটে বৈশাখ

রফিকুল ইসলাম

স্মৃতির জানালার শার্সিতে দেখি
বৈশাখি হাওয়ায় দূরের চারুচত্বর
তোমাতে মেশানো তপ্ত রোদেলা দুপুর।
আজ না হয়, প্রত্যাশারা ঘুমিয়ে পড়ুক
খসে পড়ুক, সুঘ্রাণ মাধবীর পাপড়িগুলো
অলক বেণীর বুনোনের গভীরে...
বেপরোয়া বাতাসে অপরাহ্নবেলায়
প্রলয়ঙ্কর দুরন্ত আকাশ দেখি-
এলোমেলো গুল্মলতা, ঝোপঝাড়ে বুনোফুল,
আর দোল খাওয়া ভাটফুল পড়ন্ত প্রহরে।
প্রজাপতির ডানায় এখন দুঃখ নিয়ে উড়ে
আর না বাজুক বৈশাখি মেলায়-
গালফোলানো তাল-পাতার বাঁশি,
রাত্রির দখিনা বাতাসে জেগে থাক-
আমার বৈশাখি জোছনার ঠোঁট।

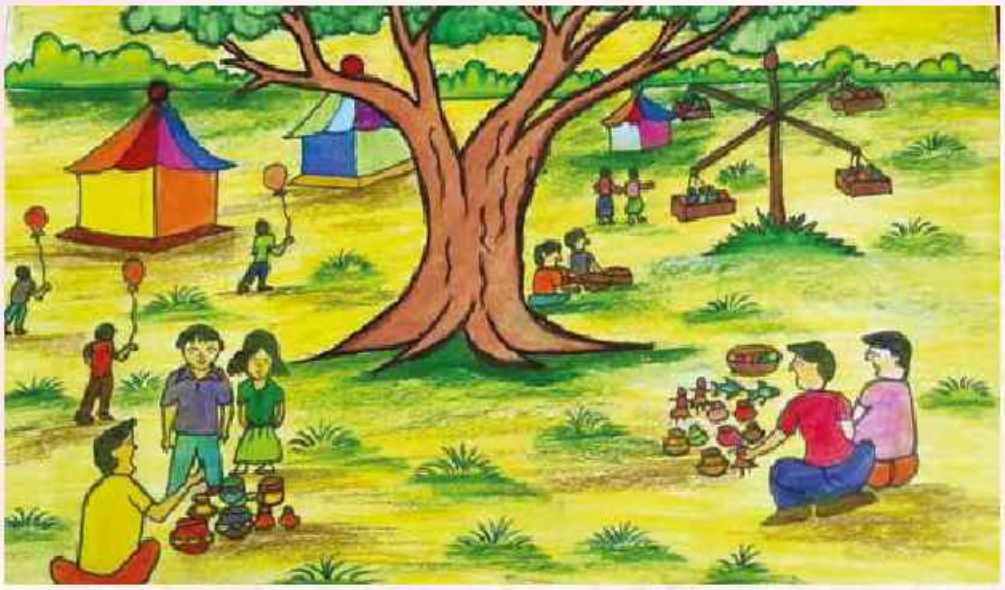

রবীন্দ্রনাথ : পারিবারিক ইতিহাস ও ঐতিহ্য

ইকবাল খোরশেদ

সাধারণ মানুষের মাঝে একটি ধারণা আছে যে, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্ম হয়েছিল সোনার চামচ মুখে নিয়ে। তাঁর সুখের সীমা ছিল না। কিন্তু ঠাকুর পরিবারের ইতিহাস ও ঐতিহ্য অনুসন্ধানে দেখা যায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ঊর্ধ্বতন সপ্তমপুরুষ পঞ্চানন কুশারী থেকে শুরু করে দ্বারকানাথ ঠাকুর পর্যন্ত অর্জিত ধন-সম্পদ রবীন্দ্রনাথের বাবা দেবেন্দ্রনাথের কালেই তলানিতে ঠেকেছিল। রবীন্দ্রনাথ-কে জমিদারি চালাতে হয়েছিল ধার-কর্জ করে। গুরুদেব 'শান্তিনিকেতন' প্রতিষ্ঠা করেন এবং আশ্রমের খরচ নির্বাহ করেন নানাজনের কাছ থেকে সাহায্য-সহযোগিতা নিয়ে। নানাজনের মধ্যে ত্রিপুরার মহারাজারা অগ্রগণ্য। রবীন্দ্র সান্নিধ্যে এসেছেন চার মহারাজা। যথাক্রমে বীরচন্দ্র মাণিক্য, রাধাকিশোর মাণিক্য, বীরেন্দ্র কিশোর মাণিক্য ও বীরবিক্রম কিশোর মাণিক্য। কবির বিশ্বভারতী স্থাপনে মুক্তহস্তে দান করেন এই মহারাজারা। রবীন্দ্রনাথের ঊর্ধ্বতন সপ্তমপুরুষ পঞ্চানন কুশারী এবং তাঁর দুই ছেলে জয়রাম ও সন্তোষরাম মতান্তরে রামসন্তোষ আঠার শতকের শুরুর দিকে কলকাতা শহর পত্তনের সময় আমিন হিসেবে কাজ করে অর্থ উপার্জন করেন।

একথা অনেকেরই জানা যে, ঠাকুরদের পূর্বের বংশ-পদবি ছিল 'কুশারী'। রবীন্দ্রনাথের পূর্ব-পুরুষদের 'কুশারী' পদবি লাভের একটি জনশ্রুতি প্রচলিত। কিংবদন্তি মতে, ঠাকুর-পরিবারের আদিপুরুষ ছিলেন শাণ্ডিল্য গোত্রের বেদজ্ঞ পণ্ডিত ভট্টনারায়ণ। ভট্টনারায়ণের জীবনকাল নিয়ে মতভেদ থাকলেও বিভিন্ন সূত্র থেকে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী তিনি খ্রিষ্টীয় অষ্টম শতকে বর্তমান ছিলেন। গৌড় বঙ্গের ব্রাহ্মণ কুলের 'কুলজি' (বংশানুক্রমিক ইতিহাস-গ্রন্থ) সূত্রে জানা যায়, বঙ্গরাজ আদিশূর (আনু. ৭০০ থেকে ৮৫০ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে) বৈদিক যজ্ঞ সম্পন্ন করার জন্য কান্যকুব্জ (বর্তমান কৌনজ) থেকে পাঁচজন ব্রাহ্মণ-কে বাংলায় নিয়ে আসেন। ভট্টনারায়ণ তাঁদের অন্যতম। তাঁর রচিত 'বেণীসংহার' নাটক সংস্কৃত সাহিত্যে প্রসিদ্ধ। নগেন্দ্রনাথ বসু ও ব্যোমকেশ মুস্তাফী 'বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস' গ্রন্থে কুশারী-পরিবারকে ভট্টনারায়ণের বংশধর হিসেবে উল্লেখ করেছেন। ভট্টনারায়ণের চতুর্দশ পুত্র দীননাথ কুশারী বংশের আদিপুরুষ বলে গ্রন্থটিতে উল্লেখ আছে। মহারাজ আদিশূরের পৌত্র ক্ষিতিশূর বর্ধমানের কাছে 'কুশ' নামের একটি গ্রাম ভট্টনারায়ণের উত্তর-পুরুষ দীননাথ-কে দান করেন। কুশ গ্রামের নামানুসারে দীননাথ ও তাঁর বংশধরদের নামের সাথে 'কুশারী' পদবি যুক্ত হয়। মনে করা হয়, পরবর্তী কোনো একসময়ে কুশারীরা যশোর, খুলনা অঞ্চলে বসতি স্থাপন করেন। এই ইতিহাস মেনে নিলে সংস্কৃত পণ্ডিত ভট্টনারায়ণই কুশারী বংশের আদিপুরুষ। প্রমত্তা ভৈরব নদীর তীরে পিঠাভোগ গ্রামে কুশারী বংশের যে আদি পুরুষের নাম জানা যায়, তিনি রামগোপালপুর জগন্নাথ কুশারী। জগন্নাথ কুশারী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ঊর্ধ্বতন ত্রয়োদশ পুরুষ।

ওই সময়ে দক্ষিণডিহির রায়চৌধুরী -পরিবারের চার ভাই কামদেব, জয়দেব,

রতিদেব ও শুকদেব বেশ আয়েশি জীবন-যাপন করছিলেন। বিষয়-সম্পত্তি জমিজমা ক্ষমতা প্রতিপত্তি কোনো কিছুর অভাব ছিল না তাঁদের। বড়ো দুই ভাই রাজদরবারের কর্মচারী ছিলেন। 'মহম্মদ তাহির পীর আলির দরবারে তাঁদের খাতির প্রতিপত্তি ছিল যথেষ্ট।' এসব নানা কারণে অন্য ব্রাহ্মণদের ঈর্ষার পাত্র হয়েছিলেন রায়চৌধুরীর বংশধরেরা। 'পীর আলির' নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে গিয়ে ভোজন-ঘ্রাণ দোষে অভিযুক্ত হয়ে কামদেব ও জয়দেব ধর্মান্তরিত হন। তাঁদের অপর দুই ভাই শুকদেব ও রতিদেব ওই ভোজসভায় নিমন্ত্রিত ছিলেন না। বড়ো দুই ভাইকে কিছু করতে না পেরে ব্রাহ্মণসমাজ ছোটো দুই ভাইকে চরম শাস্তি দিয়ে 'পতিত' ঘোষণা করেন। ঘটনাটি ছিল এমন:

বর্তমান খুলনা জেলার দক্ষিণডিহি গ্রামটির পূর্বের নাম ছিল পরগ্রাম। তুর্ক আফগান শাসনামল (১২০৬–১৫২৬ খ্রিষ্টাব্দ)-এর প্রথম দিকে স্থানীয় এক ব্রাহ্মণ বংশ-কে রাজ সরকার সম্মানজনক রায়চৌধুরী উপাধিতে ভূষিত করেন। দক্ষিণা নারায়ণ ও নাগর নাথ ওই বংশের কৃতি সন্তান ছিলেন। নাগর নিঃসন্তান। দক্ষিণা নারায়ণের চার ছেলে- কামদেব, জয়দেব, রতিদেব ও শুকদেব। কামদেব ও জয়দেব স্থানীয় শাসনকর্তা খান জাহান আলির অধীনে উচ্চপদে কাজ করেন। দরবারের আরেক ব্রাহ্মণসন্তান মুসলিম এক নারীকে বিয়ে করে ধর্মান্তরিত হন। তার নতুন নাম হয় 'মহম্মদ তাহির', মতান্তরে 'মামুদ তাহির'। ধর্মান্তরিত ব্রাহ্মণসন্তান মহম্মদ তাহির পিরল্যা নামের গ্রামে বাস করতেন। মহম্মদ তাহির-এর নামের সঙ্গে পিরল্যা যুক্ত হয়ে লোকমুখে তা 'পীর আলি' রূপ লাভ করে। কথিত আছে, ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করায় খান জাহান আলি খুশি হয়ে তাঁকে 'চেঙুটিয়া' নামের পরগনাটি দান করেন।

'নও মুসলিম গোরু খাওয়ার জন্য'। মহম্মদ তাহির নিজে যেমন গোরুর মাংস খেতেন, তেমনি তার অনুসারীদের গোমাংস খেতে উৎসাহিত করতেন। প্রচলিত আছে, রমজান মাসের কোনো এক সন্ধ্যায় মহম্মদ তাহির একটি সুগন্ধী লেবু নাকের কাছে ধরে ঘ্রাণ নিচ্ছিলেন। এ দৃশ্য দেখে কামদেব ও জয়দেব মহম্মদ তাহির-কে বলেন যে, সুগন্ধী লেবু শোঁকার কারণে তাঁর রোজা ভেঙে গেছে। কেননা, শাস্ত্রে আছে, 'ঘ্রাণং অর্ধনং ভোজনং'। মহম্মদ তাহির অত্যন্ত রেগে যান এবং এর প্রতিশোধ নেওয়ার সংকল্প করেন। কিছুদিন পর মহম্মদ তাহির সবাইকে নিমন্ত্রণ করেন। নিমন্ত্রিতদের মাঝে কামদেব ও জয়দেবও আছেন। মহম্মদ তাহিরের নির্দেশে তার অনুগামীরা ঘরের ভেতরে কয়েকটি উনুন জ্বালিয়ে গোরুর মাংস রান্না করতে শুরু করে। গোমাংসের গন্ধ নাকে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অনেকে নাকে কাপড় চেপে চলে যান। যেতে পারেন না কামদেব ও জয়দেব। মহম্মদ তাহির তাঁদের চেপে ধরেন, ঘ্রাণ দোষে অভিযুক্ত করে ধর্মান্তরিত হতে বাধ্য করেন। জোরপূর্বক ধর্মান্তরিত হওয়ার পর কামদেবের নাম হয় কামালউদ্দিন খাঁ ও জয়দেবের নাম জামালউদ্দিন খাঁ। লোকজন তাঁদের 'পিরালি বামুন' বলে ডাকতে শুরু করে। সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের কারণে রায়চৌধুরী বংশের সন্তানদের ঈর্ষার চোখে দেখত ব্রাহ্মণেরা। তাঁরা কামদেব ও জয়দেবের অপর দুই ভাই রতিদেব ও শুকদেবকেও 'পিরালি ব্রাহ্মণ' হিসেবে সমাজে 'পতিত' বলে ঘোষণা করেন। আত্মীয়স্বজনের অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে রতিদেব নিরুদ্দেশ হন। ধারণা করা হয়, তার কোনো ছেলেমেয়ে ছিল না, ফলে তারপক্ষে বৈরাগ্য গ্রহণ করা সহজ ছিল। ভাগ্যবিড়ম্বিত শুকদেব একঘরে হয়ে গ্রামেই রয়ে যান। ঘটকদের পুঁথি থেকে জানা যায় :

"খান জাহান মহামান পাতশা নফর
বশোর সনন্দ লয়ে করিল সফর ॥
তার মুখ্য মহাপাত্র মামুদ তাহির
মারিতে বামুন বেটা হইল হাজির ॥
পূর্বেতে আছিল সেও কুলিনের নাতি
মুসলমানী রূপে মজে হারাইল জাতি ॥
পীর আলী নাম ধরে পীরাল্যা গ্রামে বাস
যে গাঁয়েতে নবদ্বীপের হইল সর্বনাশ ॥..."

একদিন প্রমত্তা ভৈরব নদীতে বজরা ভাসান জগন্নাথ কুশারী। সন্ধ্যার ঠিক আগমুহূর্তে ঝড়ের কবলে পড়ে বজরা। মাঝিরা নোঙর করে দক্ষিণডিহির কেয়াতলা ঘাটে। দুর্যোগের রাতে জগন্নাথ কুশারী আশ্রয় নেন রায়চৌধুরী বাড়িতে। কন্যাদায়গ্রস্ত শুকদেব নিজের দুর্ভাগ্যের কথা সবিস্তারে বলেন জগন্নাথ-কে। সব শুনে ব্রাহ্মণপুত্র জগন্নাথ শুকদেবের মেয়েকে বিয়ে করেন। জগন্নাথ আর ফিরে যেতে পারেননি স্বগ্রামে। 'পতিত ব্রাহ্মণ' রূপে 'পিরালি' থাকের অন্তর্ভুক্ত হন। শুকদেব জামাতাকে যথাযথ সম্মান দিয়ে 'বারোপাড়া' নামে একটি গ্রামে বসতি গড়ে দেন। 'ঠাকুরবাড়ির কুলপঞ্জির হিসাবে সময়টা হচ্ছে ১৪৩২ খ্রিষ্টাব্দ।'

কুয়াশাচ্ছন্ন দূর অতীতের পারিবারিক ইতিহাস অনুসন্ধান খুব সহজ কাজ নয়। খানিকটা সাহিত্যিক উপাদান, খানিকটা শোনা কথার ওপর ভর করে গড়ে ওঠে পারিবারিক ইতিহাস। কোনো কোনো বিবরণ মতে, জগন্নাথ কুশারী নয়, শুকদেবের কন্যাকে বিয়ে করেছিলেন তাঁর পুত্র পুরুষোত্তম। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পিতা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রতিদিন ভোরে যে-মন্ত্র আবৃত্তি করে পিতৃপুরুষদের বন্দনা করতেন, তার শুরুতে আছে পুরুষোত্তমের নাম :

"পুরুষোত্তমাঙ্গলরামঃ বলরামাদ্ধরিহরঃ
হরিহরাদ্রামানন্দঃ রামানন্দান্মহেশঃ
মহেশাৎ পঞ্চাননঃ পঞ্চাননাজ্জয়রামঃ
জয়রামান্নীলমণিঃ নীলমণিরামলোচনঃ
রামলোচনাদ্দারকনাথঃ নমঃ পিতৃপুরুষেভ্যো
নমঃ পিতৃপুরুষেভ্যো"

এই মন্ত্রে জগন্নাথের নাম নেই। জগন্নাথ না কি পুরুষোত্তম- কে শুকদেবকন্যাকে বিয়ে করেছিলেন তা নিঃসংশয় নয়। 'নাম দুটি সমার্থকও বটে। সেকালে বলা হত পুরুষোত্তম জগন্নাথ।' নীলকান্তর একটি কারিকাতেও পাওয়া যায়:

"পুরুষ-উত্তম জগন্নাথ
চন্দ্রেন শুকদেবের সাথ
দেখিয়া সুন্দর মেয়ে
পুরুষোত্তম কন্দ্রেন বিয়ে।"

নগেন্দ্রনাথ বসু ও ব্যোমকেশ মুস্তাফী 'পুরুষোত্তম শব্দটি জগন্নাথের বিশেষণ' বলে উল্লেখ করেন। অন্যদিকে জগন্নাথের চার পুত্রের মধ্যে (প্রিয়ঙ্কর, পুরুষোত্তম, হৃষীকেশ ও মনোহর) পুরুষোত্তম দ্বিতীয়। পুরুষোত্তম কিংবা তার পিতা জগন্নাথ, কে বিয়ে করেছিলেন শুকদেবকন্যাকে এই মীমাংসায় না গিয়েও আমরা মনে রাখতে পারি, শাণ্ডিল্য গোত্রীয় বেদজ্ঞ পণ্ডিত ভট্টনারায়ণ কুশারীবংশের আদিপুরুষ এবং জগন্নাথ কুশারী বা পুরুষোত্তম বিদ্যাবাগীশ হলেন জোড়াসাঁকো ঠাকুর-পরিবারের আদিপুরুষ।

পুরুষোত্তমের ছেলে বলরাম কুশারী রবীন্দ্রনাথের ঊর্ধ্বতন একাদশপুরুষ। তাঁর ছেলে হরিহর কুশারী রবীন্দ্রনাথের ঊর্ধ্বতন দশমপুরুষ। হরিহরের ছেলে রামানন্দ কুশারী রবীন্দ্রনাথের ঊর্ধ্বতন নবমপুরুষ।

রামানন্দের ছেলে মহেশ (মহেশ্বর) কুশারী রবীন্দ্রনাথের ঊর্ধ্বতন অষ্টমপুরুষ। ঊর্ধ্বতন সপ্তম পুরুষ মহেশ্বরের ছেলে পঞ্চানন কুশারীর মনে উচ্চাশা জন্মে। গতানুগতিক একঘেঁয়ে জীবন তার পছন্দ নয়। তিনি তাঁর সমবয়সী কাকা শুকদেবকে সঙ্গে করে স্বগ্রাম ছেড়ে ভাগ্যান্বেষণে বেরিয়ে পড়েন। ধারণা করা হয়, তাঁরা সেকালের প্রচলিত নিয়ম ভেঙে সপরিবারেই গ্রাম ত্যাগ করেছিলেন। সঙ্গে নিয়ে আসেন গৃহদেবতা লক্ষ্মীজনার্দন শীলা।

সতের শতকের শেষে ভাগে 'একদিন তাঁরা এসে পৌঁছোলেন গোবিন্দপুরে।' (গোবিন্দপুর, সুতানটি ও কলিকাতা- এই তিনটি গ্রাম মিলে ব্রিটিশ ভারতের রাজধানী শহর কলকাতা গড়ে ওঠে)। আদি গঙ্গার তীরে গোবিন্দপুর গ্রাম তখন একটুকরো জলাভূমি। অধিবাসীরা সব কৈবর্ত্য, বেশিরভাগ মৎস্যজীবী। পঞ্চানন ও তাঁর কাকা শুকদেবকে পেয়ে তাঁরা দারুণ খুশি। স্থানীয়রা ব্রাহ্মণ সন্তানদের 'ঠাকুর' বলে ডাকতে শুরু করেন। ফলে পণ্ডিত ভট্টনারায়ণের উত্তর-পুরুষ পঞ্চাননের নাম থেকে পারিবারিক পদবি 'কুশারী' চিরদিনের জন্য মুছে যায়। তিনি হয়ে ওঠেন 'ঠাকুর'। ভাগ্যান্বেষণে আসা পঞ্চানন ও শুকদেব সাহেবদের জাহাজে ফুট-ফরমায়েশ খাটতে শুরু করেন। বুদ্ধি খাটিয়ে কিছু কিছু ভাষাও আয়ত্ত করে নেন। ধীরে ধীরে জাহাজে মালামাল সরবরাহ করতে থাকেন। জাহাজের কর্মচারীরা ভাবতে শুরু করেন পঞ্চানন ও শুকদেবের পদবি হলো 'ঠাকুর'। 'বিদেশি উচ্চারণে ঠাকুর কখনও শোনাতো টাক্কর কখনও বা টেগর।' জাহাজে মালামাল সরবরাহ করে অর্থ উপার্জনের পাশাপাশি পঞ্চানন গোবিন্দপুরে (বর্তমান ফোর্ট উইলিয়াম ও ময়দান অঞ্চল) জমি কিনে বসতবাড়ি ও শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর দুই পুত্র জয়রাম ও সন্তোষরাম মতান্তরে রামসন্তোষ। জয়রাম ও তাঁর ভাই সন্তোষরামের সঙ্গে ইংরেজ বণিকদের মেলামেশা থাকায় তাঁরা কিছু কিছু ইংরেজি শিখতে পারেন, তা ছাড়া তখনকার রীতি অনুসারে ফারসি ভাষাতেও ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। জয়রাম 'ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি'র পে-মাস্টারের অধীনে প্রধান কর্মচারী নিযুক্ত হন। 'কলিকাতা', 'সুতানটি' ও 'গোবিন্দপুর' ইংরেজদের অধীনে আসার পর ১৭০৭ খ্রিষ্টাব্দে ওই অঞ্চলে প্রথম জরিপের কাজ হয়। এই কাজে দু'জন আমিনের প্রয়োজন হলে পঞ্চাননের অনুরোধে কলকাতার তৎকালীন কালেক্টর রালফ সেলডন জয়রাম ও সন্তোষরাম-কে আমিনের কাজে নিযুক্ত করেন। এভাবে ধীরে ধীরে তারা বিত্তশালী হয়ে ওঠেন। জয়রাম ধনসায়রে আর সন্তোষরাম তালতলায় বাড়ি করেন। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি কলকাতার দক্ষিণে দশ মাইল অবধি আটত্রিশটি গ্রাম কিনলে এগুলোর জরিপের কাজও জয়রাম এবং সন্তোষরামই সম্পন্ন করেন। অবস্থা ফিরলেও বারোপাড়া গ্রাম বা পিরালি ব্রাহ্মণদের সঙ্গে এদের যোগাযোগ অক্ষুণ্ণ থাকে। দু'জনেই বিয়ে করেন যশোরের পিরালি পরিবারে। 'জয়রামের স্ত্রীর নাম গঙ্গা। সন্তোষরামের স্ত্রী সিদ্ধেশ্বরী।' গঙ্গার গর্ভে জয়রামের চার ছেলের জন্ম হয়- আনন্দীরাম, নীলমণি, দর্পনারায়ণ ও গোবিন্দরাম।

জয়রাম ঠাকুরের দ্বিতীয় ছেলে নীলমণি ঠাকুর জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির প্রতিষ্ঠাতা, দ্বারকানাথ ঠাকুরের পিতামহ, রবীন্দ্রনাথের ঊর্ধ্বতন পঞ্চম পুরুষ। জয়রামের মৃত্যুর পর নীলমণি ও তাঁর ছোটো ভাই দর্পনারায়ণ ধনসায়রের বাড়ি বিক্রি করে এবং ১৭৫৭ খ্রিষ্টাব্দে পলাশীর যুদ্ধের পর মীর জাফরের দেওয়া ক্ষতিপূরণের টাকাসহ মোট ১৩০০০ (তেরো হাজার) টাকা পান। 'এই টাকা থেকে কিছু টাকা দিয়ে কলিকাতা গ্রামের পাথুরিয়াঘাটা পাড়ায় জমি কিনে ভিটা তোলেন।' কনিষ্ঠ ভাই গোবিন্দরামের মৃত্যুর (১৭৭১) পর তাঁর বিধবা পত্নী রামপ্রিয়া দেবী ১৭৮২ খ্রিষ্টাব্দে সুপ্রিমকোর্টে মামলা করেন। এই মামলার ফলে ঠাকুর পরিবার তিন ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। রামপ্রিয়া দেবী দুটি বাড়ি পান। এই মামলার সূত্রেই নীলমণি ও দর্পনারায়ণের মধ্যে সম্পত্তি নিয়ে গোলোযোগ বাধে। ফলে নীলমণি নিজের উপার্জিত অর্থ, এক লাখ টাকা ক্ষতিপূরণ ও গৃহদেবতা লক্ষ্মীজনার্দন শিলার ভার নিয়ে পাথুরিয়াঘাটার বাড়ি ছেড়ে চলে আসেন। পঞ্চানন থেকে সৃষ্ট ঠাকুর পরিবার এভাবে দুটি শাখায় বিভক্ত হয়ে যায়।

নীলমণি জোড়াবাগানের বৈষ্ণবচরণ শেঠের কাছ থেকে লক্ষ্মীজনার্দন শিলার নামে মেছুয়াবাজার (তৎকালীন জোড়াসাঁকো অঞ্চলের নাম) এলাকায় একবিঘা জমি কিনে আটচালা ঘর তুলে বসবাস করতে আরম্ভ করেন। এভাবে ১৭৮৪ খ্রিষ্টাব্দের জুন মাসে জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির পত্তন হয়। নীলমণি ঠাকুরের তিন ছেলে ও এক মেয়ে। নীলমণি ঠাকুরের জ্যেষ্ঠপুত্র রামলোচন ঠাকুর ছিলেন প্রখর বিষয়বুদ্ধির অধিকারী। প্রচুর বিষয়-সম্পত্তি অর্জন করে রামলোচন ঠাকুর পরিবারের বৈভব ও মর্যাদা বাড়ান। রামলোচনের পূর্বপুরুষেরা সমাজে সম্পন্ন ব্যবসায়ী বলেই গণ্য ছিলেন। রামলোচনই প্রথম জমিদার হিসেবে অভিজাত শ্রেণিভুক্ত হন। জেলায় জেলায় জমিদারি কেনা ছাড়াও কলকাতা শহরেই বাড়ি ও জায়গা কেনেন অন্তত দশটি। ঠাকুর পরিবারের শৌখিনতা ও আভিজাত্যের প্রকাশ রামলোচনের সময় থেকেই আরম্ভ হয়। অপরাহ্নে ছুড়িগাড়ি চড়ে হাওয়া খেতে বের হওয়ার প্রথা তিনিই চালু করেন। এছাড়াও কবিওয়ালা ও কালোয়াতদের (উচ্চাঙ্গসংগীতে পারদর্শী ব্যক্তি) বাড়িতে আমন্ত্রণ জানিয়ে মজলিশ বসানো এবং আত্মীয়-বন্ধুদের নিমন্ত্রণ করে গান শোনানো তাঁর অন্যতম শখ ছিল। তাঁর একটি মেয়ে জন্মগ্রহণ করেই মারা যায়। এরপর রামলোচন তাঁর পরের ভাই রামমণির ছেলেকে দত্তক নেন। রামলোচনের স্ত্রী মেনকা ও রামমণির স্ত্রী অলকা সহোদর বোন ছিলেন, তাই দত্তক গ্রহণে বংশধারা কোনোদিক থেকেই ব্যাহত হয়নি। এই দত্তক ছেলেই হলো দ্বারকানাথ ঠাকুর। রবীন্দ্রনাথের পিতামহ। ১৮০৭ খ্রিষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে রামলোচন উইল করে দ্বারকানাথকে তাঁর সম্পত্তির উত্তরাধিকারী করেন।

দ্বারকানাথ ঠাকুরের (১৭৯৪- ০১.০৮.১৮৪৬) জন্মের সময়ই জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবার ধনশালী বলে খ্যাতি অর্জন করে। তবে তখনকার দিনে জমিদারি না থাকলে অভিজাত বলে সম্ভ্রম ও মর্যাদার অধিকারী হওয়া যেত না; দ্বারকানাথের দত্তকগ্রহীতা পিতা রামলোচনই প্রথম কুষ্টিয়ার অন্তর্গত বিরাহিমপুর পরগনা এবং উড়িষ্যার কটক জেলায় পাতুয়া ও বালিয়া নামে দুটি মহাল কিনে জমিদার হয়ে ওঠেন এবং অভিজাত শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত হন। দ্বারকানাথ, রপ্তানি বাণিজ্য, ব্যাঙ্ক, বীমা, জাহাজ ও নীলচাষের ব্যবসা করে আর্থিক সমৃদ্ধি লাভ করেন। ১৮৩৪ খ্রিষ্টাব্দে উইলিয়াম কার নামে এক ইংরেজ অংশীদারকে নিয়ে তিনি স্থাপন করেন 'কার টেগোর অ্যান্ড কোম্পানি'।

দ্বারকানাথ ক্রমান্বয়ে বৈষয়িক সাফল্যে, আধুনিক শিক্ষায় উৎসাহদানে, সাম্প্রদায়িকতার ঊর্ধ্বে উঠে মেধানির্ভর ধর্মচর্চায়, শিল্প-সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতায়, বাণিজ্যবুদ্ধিতে, ভোগে ও চিন্তায় সমানভাবে বাঙালির পুনর্জাগরণের ইতিহাসের অন্যতম প্রধান পুরুষ হয়ে ওঠেন। তাঁকে বলা হতো প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর। তবে, তিনি যেমন দু'হাত ভরে উপার্জন করতেন তেমনি দু'হাত খুলে ব্যয় ও অপব্যয়ও করতেন। আনুমানিক ১৮০৯ খ্রিষ্টাব্দে যশোর জেলার নরেন্দ্রপুর গ্রামের রামতনু রায়চৌধুরী ও আনন্দময়ীর মেয়ে দিগম্বরীর সঙ্গে দ্বারকানাথের বিয়ে হয়। বিয়ের সময় দ্বারকানাথের বয়স ১৫ আর দিগম্বরীর আনুমানিক ৬ বছর। দিগম্বরী ও দ্বারকানাথের পাঁচ ছেলে- দেবেন্দ্রনাথ, নরেন্দ্রনাথ, গিরিন্দ্রনাথ, ভূপেন্দ্রনাথ ও নগেন্দ্রনাথ।

১৮৪৫ খ্রিষ্টাব্দের ৪ঠা মার্চ দ্বারকানাথ শেষবারের মতো বিলেতে যান। পরের বছর ১লা আগস্ট মাত্র ৫১ বছর বয়সে লন্ডনের নিকটবর্তী 'সারে' শহরে তাঁর মৃত্যু হয়। মৃত্যুর দেড় বছরও কাটেনি, বিশ্বমন্দার প্রভাবে 'ইয়ুনিয়ন ব্যাঙ্কে'র পতন হয় ১৮৪৭ খ্রিষ্টাব্দের ২৭ ডিসেম্বর। এর তিন সপ্তাহের মধ্যে ১৮৪৮ খ্রিষ্টাব্দের ১৫ জানুয়ারি কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে বন্ধ হয়ে যায় 'কার টেগোর অ্যান্ড কোম্পানি'। ধস নামতে থাকে ঠাকুর-পরিবারের বিত্ত-বৈভবে।

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৫.০৫.১৮১৭-১৯.০১.১৯০৫) কুশারী বংশের কলকাতাবাসী পঞ্চম পুরুষ; দ্বারকানাথ ঠাকুর ও দিগম্বরী দেবীর জ্যেষ্ঠপুত্র। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পিতা। সম্পদ বাড়ানোর প্রতি মনোযোগের অভাব প্রথম লক্ষ্য করা যায় দ্বারকানাথের ছেলে দেবেন্দ্রনাথের চরিত্রে। বিষয়-সম্পদের ব্যাপারে তাঁর কোনো আগ্রহ ছিল না। প্রথম যৌবনে সম্ভবত খানিকটা পিতার অমতে যেতে অপারগ হয়েই দ্বারকানাথের ব্যাঙ্কে চাকরি করেন। প্রথম দিকে তাঁর দিন কাটত বিলাসিতা করে। পরে পিতামহীর মৃত্যুর পর অকস্মাৎ জীবনের প্রতি তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি পাল্টে যায়। তাঁর সমস্ত মনোযোগ গিয়ে পড়ে ধর্মাচরণে। সেই আবেগে প্রথম দিকে পারিবারিক সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণেও তাঁর অনীহা দেখা দেয়। কিন্তু ক্রমান্বয়ে তিনি সেই মানসিক অবস্থা কাটিয়ে ওঠেন; সম্পদ বাড়াতে না পারেন, পিতার সম্পদের যা অবশিষ্ট ছিল তার রক্ষণাবেক্ষণে যত্নবান হন। তবে ব্রাহ্মধর্মের প্রতিষ্ঠা ও প্রসারের জন্য তাঁর নাম সমধিক খ্যাত। ১৮৩৪ খ্রিষ্টাব্দে খুলনা জেলার দক্ষিণডিহি গ্রামের রামনারায়ণ চৌধুরীর মেয়ে সারদাসুন্দরী দেবীর সঙ্গে দেবেন্দ্রনাথের বিয়ে হয়। বিয়ের সময় দেবেন্দ্রনাথের বয়স ছিল ১৮ আর সারদা দেবীর ৬, মতান্তরে ৮ বছর। দেবেন্দ্রনাথ ও সারদাসুন্দরী দেবীর ঘরে ১৫টি ছেলেমেয়ের জন্ম হয়। যথাক্রমে একটি মেয়ে (অল্পায়ু), দ্বিজেন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ, হেমেন্দ্রনাথ, বীরেন্দ্রনাথ, সৌদামিনী, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, সুকুমারী, পুণ্যেন্দ্রনাথ, শরৎকুমারী, স্বর্ণকুমারী, বর্ণকুমারী, সোমেন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ (১৮৬১ - ১৯৪১) ও বুধেন্দ্রনাথ (অল্পায়ু)।

'দেবেন্দ্রনাথের কালেই জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির বৈভব একটা বড়ো টাল খেয়ে এক জায়গায় স্থির হয়। দ্বারকানাথের ঔজ্জ্বল্য আর নেই।' ব্যবসা-বাণিজ্য সব উঠে যায়। ঠাকুর পরিবার পরিণত হয় একটি ক্ষয়িষ্ণু জমিদারবাড়িতে। "...চাকরের ভিড় কমাইয়া দিলাম, গাড়ী ঘোড়া সব নিলামে দিলাম, খাওয়াপরা খুব পরিমিত করলাম; ঘরে থাকিয়া সন্ন্যাসী হইলাম।..." লিখেছেন দেবেন্দ্রনাথ। 'কার টেগোর অ্যান্ড কোম্পানি' বন্ধ হয়ে যাওয়ার ফলে ঠাকুর-পরিবার ঋণের দায়ে পড়ে। সম্ভবত ঋণ শোধ করবার জন্যই দেবেন্দ্রনাথ বিষয়-সম্পত্তির প্রতি মন দিতে আরম্ভ করেন। তিনি নিজে শিলাইদহ শাহাজাদপুরে এসে জমিদারি দেখাশোনা করতে থাকেন। এদিকে তাঁকে দেশভ্রমণের নেশায় পেয়ে বসে। জীবনে আসে বৈরাগ্য। ঔদাসীন্য ও বিষয়-সম্পত্তির প্রতি মনোযোগ দেবেন্দ্রনাথের চরিত্রের এক বিস্ময়কর বৈপরীত্য। রবীন্দ্রনাথ জীবনস্মৃতিতে বর্ণনা করেছেন- "আমার জন্মের কয়েক বৎসর পূর্ব হইতেই আমার পিতা প্রায় দেশভ্রমণেই নিযুক্ত ছিলেন। বাল্যকালে তিনি আমার কাছে অপরিচিত ছিলেন বলিলেই হয়। মাঝে মাঝে তিনি কখনো হঠাৎ বাড়ি আসিতেন;..." তবে দূর থেকেও তিনি তাঁর ব্যক্তিত্ব ও দক্ষতার বলে পরিবার, জমিদারি ও আদি ব্রাহ্মসমাজের উপর প্রভুত্ব বজায় রাখেন। ১৮৬৭ খ্রিষ্টাব্দে সমস্ত ব্রাহ্মগণ এক হয়ে তাঁকে 'মহর্ষি' উপাধি দেন। দূর থেকেও চিঠিপত্রের মাধ্যমে তিনি সমস্ত ব্যাপারে নির্দেশনা দিতেন।

বীরভূম জেলার রায়পুরের সিংহ পরিবারের সঙ্গে দেবেন্দ্রনাথের বিশেষ বন্ধুতা ছিল। কোনো একসময় রায়পুর যাওয়ার পথে ভুবনডাঙার মাঠের অদ্ভুত শূন্য নিসর্গদৃশ্য তাঁকে আকৃষ্ট করে। সেখানকার একটিমাত্র হাতিমগাছের ছায়াকে তাঁর নির্জন সাধনার উপযুক্ত স্থান বলে মনে হয়। এরপর থেকে তিনি মাঝে মাঝেই সেখানে তাঁবু ফেলে দিন কাটাতেন। ১৮৩৬ খ্রিষ্টাব্দের ৩১ মার্চ সিংহ পরিবারের কাছ থেকে তিনি কুড়ি বিঘা জমি মাত্র পাঁচ টাকায় পাট্টা (জমির ক্রয় বা পত্তনিসম্বন্ধীয় দলিল) নেন এবং 'শান্তিনিকেতন' নামে একটি গৃহ নির্মাণ করেন ও মাঝে মাঝে সেখানে নির্জনবাস করতে থাকেন। ১৮৭৩ খ্রিষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে বালক রবীন্দ্রনাথের উপনয়নের (পইতে ধারণের অনুষ্ঠান) পর তাঁকে নিয়ে হিমালয়ে যাওয়ার সময় দেবেন্দ্রনাথ এখানে এসে কয়েক দিন থাকেন। 'আশ্রমের রূপ ও বিকাশ' গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ এ সম্পর্কে লিখেছেন: "...শান্তিনিকেতনে এসেই আমার জীবনে প্রথম সম্পূর্ণ ছাড়া পেয়েছি বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে। উপনয়নের পরেই আমি এখানে এসেছি। ...আমার জীবন নিতান্তই অসম্পূর্ণ থাকত প্রথম বয়সে এই সুযোগ যদি আমার না ঘটত।..."

ক্রমান্বয়ে দেবেন্দ্রনাথ আরো বেশি দিন কলকাতার বাইরে কাটাতে থাকেন। কর্মজীবনকে একেবারে ছুটি দিয়ে তিনি যেন নির্জনবাসের জন্য প্রস্তুত হতে থাকেন। জমিদারি দেখাশোনা করার ভার প্রথমে ছেড়ে দেন পঞ্চম ছেলে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের উপর, তারপর বড়ো জামাতা সারদাপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়ের উপর (রবীন্দ্রনাথের বিয়ের রাতে তাঁর আকস্মিক মৃত্যু হয়)। এরপর জমিদারি দেখার ভার ক্রমশ রবীন্দ্রনাথের উপর ন্যস্ত হয়।

লেখক: সাংবাদিক, গবেষক, অনুবাদক

নজরুলের ধর্মীয় সম্প্রীতির চেতনা

ড. মিল্টন বিশ্বাস

"কাটায়ে উঠেছি ধর্ম-আফিম-নেশা/ ধ্বংস করেছি ধর্মযাজকী পেশা,/ ভাঙি মন্দির, ভাঙি মসজিদ/ ভাঙিয়া গির্জা গাহি সঙ্গীত,/ এক মানবের একই রক্ত মেশা/ কে শুনিবে আর ভজনালয়ের হেষা!"

"পূজিছে গ্রন্থ ভণ্ডের দল মূর্খরা সব শোন মানুষ এনেছে গ্রন্থ, গ্রন্থ আনেনি মানুষ কোন।"

"গাহি সাম্যের গান- মানুষের চেয়ে বড় কিছু নাই, নহে কিছু মহিয়ান। নাই দেশ-কাল-পাত্রের ভেদ, অভেদ ধর্মজাতি, সব দেশে সব কালে ঘরে-ঘরে তিনি মানুষের জ্ঞাতি।"

"মানবতার এই মহান যুগে একবার/ গণ্ডি কাটিয়া বাহির হইয়া আসিয়া বল যে,/তুমি ব্রাহ্মণ নও, শূদ্র নও, হিন্দু নও, মুসলমানও নও,/তুমি মানুষ- তুমি ধ্রুব সত্য।"

উপরের উদ্ধৃতিগুলো স্মরণে রেখে জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের (১৮৯৯-১৯৭৬) জন্মজয়ন্তীতে তাঁর প্রবন্ধে প্রকাশিত সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির চেতনা সম্পর্কে আলোকপাত করা বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে খুবই তাৎপর্যবহ। এদেশ এখনো সাম্প্রদায়িক অপশক্তি থেকে মুক্ত হতে পারেনি। কিন্তু যে দায়িত্ব রাজনৈতিক দলের নেতাদের কাঁধে নিয়ে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলার কথা ছিল তাও সম্পন্ন হয়নি। এজন্য একমাত্র ভরসা রবীন্দ্রনাথ-নজরুল। বিশেষত নজরুলের জীবনব্যাপী (সুস্থ ছিলেন ১৯৪২ পর্যন্ত) সাম্প্রদায়িক অপশক্তির বিরুদ্ধে বলে যাওয়ার মধ্যে রয়েছে অনুপ্রেরণার অজেয় উৎস। কেবল তাঁর কবিতা-গান নয় প্রবন্ধে রয়েছে বিবেক জাগানিয়া অনন্য সব ভাবনাসমূহ। সান্ধ্য দৈনিক নবযুগ, অর্ধসাপ্তাহিক ধূমকেতু, সাপ্তাহিক লাঙল, গণবাণী, সওগাত, বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য-পত্রিকা প্রভৃতি পত্রিকায়-এ সম্পর্কে নজরুলের সম্পাদকীয় প্রবন্ধ এবং অভিভাষণের বক্তব্য প্রকাশিত হয়। পরে সেগুলো যুগবাণী, রাজবন্দীর জবানবন্দী, দুর্দিনের যাত্রী, রুদ্র-মঙ্গল গ্রন্থে প্রবন্ধ সংকলনে স্থান পায়। বলাবাহুল্য তাঁর অধিকাংশ প্রবন্ধের বিষয়বস্তু সমকালীন প্রসঙ্গ নিঃসৃত। আর এই সমসাময়িক প্রসঙ্গের অবতারণার জন্য তাঁর প্রবন্ধসমূহ মূল্যবান হয়ে উঠেছে। ১৯৪২ সাল পর্যন্ত বিশ্ব পরিমণ্ডল ও ভারতবর্ষের সংঘাতপূর্ণ রাজনৈতিক ইতিহাস নজরুল-সাহিত্যকে আলোড়িত করেছে। তবে তিনি তাঁর অভিমতসমূহ ব্যক্ত করার সময় সর্বজনীন মানুষের কল্যাণকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। অর্থাৎ সাম্প্রদায়িক বিভেদ ও বিদ্বেষের বিপরীতে তিনি সম্প্রীতির প্রত্যাশায় উচ্চকণ্ঠ ছিলেন। একইসঙ্গে সংকীর্ণতার ঊর্ধ্বে থেকে ধর্ম, শিক্ষা ও সমাজ নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করেছেন। বর্তমান প্রেক্ষাপটেও তাঁর ভাবনাসমূহ গুরুত্ব বহন করে।

অধ্যাপক ড. বিশ্বজিৎ ঘোষ নজরুলের অসাম্প্রদায়িক চেতনা সম্পর্কে লিখেছেন- 'উপনিবেশকে আঁকড়ে রাখার মানসে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ সুচতুর কৌশলে সাম্প্রদায়িক বিভেদ সৃষ্টি করেছিল ভারতবর্ষে ভারতের দুই বৃহৎ ধর্ম-সম্প্রদায় পরস্পর বিভেদে জড়িয়ে পড়েছে বারবার। এর পশ্চাতে ছিল একাধিক রাজনৈতিক দলের ইন্ধন। এই সাম্প্রদায়িক বিভেদ নজরুলকে ব্যথিত করেছে। তাই তিনি সচেতনভাবে হিন্দু-মুসলিমের মধ্যে সম্প্রদায়-নিরপেক্ষ সম্প্রীতি প্রত্যাশা করেছেন।

সত্য-সুন্দর-কল্যাণের পূজারি নজরুল চেয়েছেন সম্প্রদায়ের ঊর্ধ্বে মানুষের মুক্তি। বস্তুত, সাম্যবাদী চিন্তা তাঁর মানসলোকে সম্প্রদায়-নিরপেক্ষ মানবসত্তার জন্ম দিয়েছে-হিন্দু ও মুসলমান বৈপরীত্যের দ্যোতক না হয়ে তাঁর চেতনায় হতে পেরেছে জাতিসত্তার পরিপূরক দুই শক্তি।' (উত্তর-ঔপনিবেশিক তত্ত্ব ও নজরুলসাহিত্য, সৃষ্টি সুখের উল্লাসে, ২য় খণ্ড, পৃ ৩৩৬) সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে বিভেদ ও অনৈক্য সম্পর্কে নজরুল ইতিবাচক চিন্তা করেছেন। সাম্প্রদায়িক কলহের দুর্বলতা দিয়ে ভারতের মুক্তি সম্ভব নয়। নজরুল এ-কারণেই ভারতীয়দের শক্তির দুর্বলতর সূত্রগুলি 'যুগবাণী' ও অন্যান্য পর্বের সম্পাদকীয় রচনায় বিশ্লেষণ করেছেন। তিনি জানতেন হিন্দু মুসলমানের ঐক্যবদ্ধ শক্তির দুর্বার আঘাতেই ব্রিটিশ শাসনশৃঙ্খল ভাঙা সম্ভব। নজরুল আহ্বানও জানিয়েছেন ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের।

তিনি হিন্দু-মুসলমান উভয়ের ইতিহাস-ঐতিহ্য-চিন্তা-চেতনার ভাব বিনিময়ে গুরুত্বারোপ করেছিলেন। ১৯২৯ সালে চট্টগ্রাম এডুকেশন (মুসলিম সংস্কৃতির চর্চা, রুদ্র-মঙ্গল) সোসাইটির প্রতিষ্ঠা উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠানের সভাপতির ভাষণে নজরুল বলেছেন: 'ভারত যে আজ পরাধীন এবং আজো যে স্বাধীনতার পথে তার যাত্রা শুরু হয়নি শুধু আয়োজনেরই ঘটা হচ্ছে এবং ঘটাও ভাঙছে তার একমাত্র কারণ আমাদের হিন্দু-মুসলমানের পরস্পরের প্রতি হিংসা ও অশ্রদ্ধা।'

হিন্দু-মুসলমানের মিলন কামনার এই তীব্রতা নজরুলের মানবতাবোধ থেকে উৎসারিত। তাঁর সাহিত্যচিন্তার অন্যতম স্তম্ভও এটি ছিল। এজন্য তাঁর 'আমার সুন্দর' প্রবন্ধের একটি অংশ স্মরণীয়- 'আমার কেবলই যেন মনে হত আমি মানুষকে ভালোবাসতে পেরেছি। জাতি-ধর্ম-ভেদ আমার কোনদিনই ছিল না, আজও নেই। আমাকে কোনোদিন তাই কোনো হিন্দু ঘৃণা করেনি। ব্রাহ্মণেরাও ঘরে ডেকে আমাকে পাশে বসিয়ে খেয়েছেন ও খাইয়েছেন। এই আমি আমার যৌবন-সুন্দর, প্রেম-সুন্দরকে দেখলাম।'

নিজে মুসলিম হয়েও হিন্দু নারী প্রমীলাকে বিবাহ করা এবং একাধিক ঘনিষ্ঠ বন্ধু সনাতন ধর্মাবলম্বী হওয়ায় নজরুলের পক্ষে এ ধরনের কথাই স্বাভাবিক। তিনি সাম্য ও মানবকল্যাণে বিশ্বাসী ছিলেন। ফলে সর্বপ্রকার বন্ধন ও অধীনতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছেন। সমাজজীবনের অনাচার অসঙ্গতি তিনি অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করেছিলেন- শুধু রাজনৈতিক সূত্র থেকে তা অর্জন করেননি। সমাজকে ভেঙে গড়বার স্বপ্ন ও উদ্যম ছিল তাঁর ক্লান্তিহীন। 'মোহররম' প্রবন্ধে মাতম-অভিনয়কে ধিক্কার দিয়ে সত্যের পক্ষ নিয়ে নির্যাতনের প্রতিবাদে রক্ত দেবার আহ্বান জানিয়েছেন নজরুল। প্রথার অন্তরে নিহিত সত্যের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন তিনি। লিখেছেন- 'এস ভাই হিন্দু! এস মুসলমান! এস বৌদ্ধ! এস ক্রিশ্চিয়ান! আজ আমরা সব গণ্ডি কাটাইয়া, সব সঙ্কীর্ণতা, সব মিথ্যা, সব স্বার্থ চিরতরে পরিহার করিয়া প্রাণ ভরিয়া ভাইকে ভাই বলিয়া ডাকি।'

'মন্দির ও মসজিদ' আর 'হিন্দু-মুসলমান' নামে দুটি রচনাতে ভারতবর্ষের প্রধান দুই সম্প্রদায়ের পরস্পর বিদ্বেষ এবং হানাহানিকে নজরুল তীব্রভাবে আক্রমণ করেছেন। এ প্রসঙ্গে তিনি সবসময়ই সচেতন ছিলেন। 'মন্দির ও মসজিদ'-এ দাঙ্গা নিয়ে তাঁর বেদনাঘন কথা আছে। মানবতার দিকে যারা ফিরেও তাকায় না তারা ছোরা আর লাঠি নিয়ে নিজের ধর্মসম্প্রদায় রক্ষা করে! নজরুলের মতে, 'ইহারা ধর্মমাতাল। ইহারা সত্যের আলো পান করে নাই, শাস্ত্রের অ্যালকোহল পান করিয়াছে।' শাস্ত্রীয় প্রথাকে নজরুল সবসময়ই মানবতার নিচে স্থান দিয়েছেন। তাঁর মতে, 'মারো শালা যবনদের!' আর 'মারো শালা কাফেরদের!' হাঁক ছেড়ে মাতালের চিৎকার দিয়ে তারা নাকি আল্লাহ্ এবং মা কালীর 'প্রেস্টিজ' রক্ষা করে। আর মারণ আঘাতে লুটিয়ে পড়লে তারা সকলেই আল্লাহ্ বা মা কালীকে না ডেকে 'বাবা গো, মা গো' বলে চিরকালের বাঙালির মতো একইভাবে কাতরায়! 'হিন্দু-মুসলমান' লেখাতেও রবীন্দ্রনাথের বরাত দিয়ে নজরুল বলেছেন, 'যে ন্যাজ বাইরের, তাকে কাটা যায়, কিন্তু ভিতরের ন্যাজ কাটবে কে?' টিকি আর দাড়ি হচ্ছে মানুষের সেই ন্যাজ। এ ন্যাজ মাথায় আর মুখে নয়, গজিয়েছে মনের গভীরে; তা থেকেই এত বিদ্বেষ। আর, দাড়ি কামানো খায়রু মিয়া ছুরি খেলে, কিংবা 'তুর্কিছাঁট-দাড়ির শশধর বাবু' ছুরি খেলে প্রথম ক্ষেত্রে মুসলমান আর দ্বিতীয় ক্ষেত্রে হিন্দু শব নিয়ে কবরস্থান বা শ্মশানে ছোটে না। দুঃখ এই, 'মানুষ আজ পশুতে পরিণত হয়েছে, তাদের চিরন্তন আত্মীয়তা ভুলেছে। পশুর ন্যাজ গজিয়েছে ওদের মাথার ওপর, ওদের সারা মুখে। ওরা মারছে... টিকিকে, দাড়িকে। বাইরের চিহ্ন নিয়ে এই মূর্খদের মারামারির কি অবসান নেই!'

আসলে 'হিন্দু-মুসলমান ঐক্য' নজরুলের অন্যতম প্রিয় বিষয় ছিল। যৌবনের প্রতি এই কবির আবেদন, 'আমার ধর্ম যেন অন্য ধর্মকে আঘাত না করে, অন্যের মর্মবেদনার সৃষ্টি না করে।' একই দেশের ফুলে-ফসলে পুষ্ট দুই সম্প্রদায়ের বিরোধ অত্যন্ত নিন্দনীয়। অথচ সাম্প্রদায়িক-রাজনৈতিক নেতারা নিজ নিজ সম্প্রদায়কে 'ধর্মের নামে উগ্র মদ পান' করিয়ে অযথা মাতাল করে তুলে বিরোধ সৃষ্টি করছেন। আর শিক্ষা-বঞ্চিত সাধারণ মানুষকে করে তুলেছেন নিজেদের হাতের পুতুল। রাজনৈতিক নেতারা চারপাশে 'ভাড়াটিয়া মোল্লা মৌলবি পণ্ডিত পুরুত' জুটিয়ে নিয়ে তাদের দিয়ে আপন আপন সম্প্রদায়ের পক্ষে ওকালতির ব্যবস্থা করেন। নজরুলের কথা, তরুণরা যেন 'কদর্য' হানাহানির ঊর্ধ্বে থাকে। স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন, 'ইসলাম ধর্ম কোনো অন্য ধর্মাবলম্বীকে আঘাত করিতে আদেশ দেন নাই। ইসলামের মূলনীতি সহনশীলতা। পরমতসহনশীলতার অভাবে অশিক্ষিত প্রচারকদের প্রভাবে আমাদের ধর্ম বিকৃতির চরম সীমায় গিয়া পৌঁছিয়াছে।' যুবসমাজের উদ্দেশে বলেছেন, 'মানুষকে মানুষের সম্মান দিতে যদি না পারেন, তবে বৃথাই আপনি মুসলিম।' মুসলমানদের ভুল আর পশ্চাদ্‌পদতা বিষয়ে লেখকের ওই দুর্ভাবনা এ যুগের জন্যেও অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। নজরুলের 'শেষকথা', 'আমরা যৌবনের

পূজারী, নব-নব সম্ভাবনার অগ্রদূত...।' পৃথিবীর অগ্রগামী পথিকদের সঙ্গে সমতালে পথ চলব। পরস্পর যাবতীয় বিভেদ ভুলে সঙ্গবদ্ধতায় উদ্বুদ্ধ করবার চেষ্টা করেছেন তিনি।

কাজী নজরুল ইসলাম লক্ষ করেছেন ভারতবর্ষের অগ্রগতি বারবার বাধাগ্রস্ত হয়েছে জাতি, ধর্ম, বর্ণ, আভিজাত্যবোধের কারণে। হিন্দু-মুসলমানের ঐক্য সাধনের মাধ্যমে অগ্রগতি ত্বরান্বিত করায় নজরুল ছিলেন আন্তরিক। হিন্দু-মুসলমান বিরোধের মূলে উভয় সম্প্রদায়ের পারস্পরিক জ্ঞানবিমুখতাকে নজরুল চিহ্নিত করেছেন। সমাজ-অন্তর্গত একটি সম্প্রদায়ের মানুষ কুসংস্কার, গোঁড়ামি, বৈষম্য, সংঘাত, দাঙ্গায় সভ্যতা-সমাজ-সময়-রাষ্ট্রের গতিশীলতা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ক্রমেই পিছিয়ে পড়ছে; নজরুল সেই সম্প্রদায়-অন্তর্গত সকল মানুষকে রক্ষণশীল কুসংস্কারাচ্ছন্ন জগত থেকে আলোকিত পৃথিবীতে পদচারণার আহ্বান জানিয়ে বলেছেন- ১. আজ বাঙালি মুসলমানদের মধ্যে, একজনও চিত্রশিল্পী নাই, ভাস্কর নাই, সঙ্গীতজ্ঞ নাই, বৈজ্ঞানিক নাই, ইহা অপেক্ষা লজ্জার আর কি আছে?' (তারুণ্যের সাধনা) ২. দেয়ালের পর দেয়াল তুলে আমরা ভেদ-বিভেদের জিন্দাখানার সৃষ্টি করেছি; কত তার নাম সিয়া, সুন্নি, শেখ, সৈয়দ, মোগল, পাঠান, হানাফি, শাফি, হাম্বলি, মালেকি, লা-মাজহাবি, ওহাবি ও আরো কত শত দল। ... সকল ভেদ-বিভেদের প্রাচীর নিষ্ঠুর আঘাতে ভেঙে ফেল।' (বাংলার মুসলিম বাঁচাও)

এভাবেই উভয় সম্প্রদায়ের বিরোধের প্রাচীর ভেঙে ফেলতে চেয়েছেন কবি। নজরুল অন্য ধর্মের কূপমণ্ডুকতা, কুসংস্কার আর প্রাচীন প্রথার অবরোধগুলো উন্মোচন করে মানুষের পারস্পরিক মিলনের মাধ্যমে সম্প্রীতি তৈরি করতে চেয়েছেন। হিন্দুসমাজের অস্পৃশ্যতা সম্বন্ধে কবির অভিমত- 'হিন্দু ধর্মের মধ্যে এই মৃত্যুকারূপ কুষ্ঠ রোগ যে কখন প্রবেশ করিল তাহা জানি না, কিন্তু ইহা যে আমাদের হিন্দু ভ্রাতৃদের একটা বিরাট জাতির অস্থিমজ্জায় ঘুণ ধরাইয়া একেবারে নির্বীর্য করিয়া তুলিয়াছে, ...।'(ধূমমার্গ)

আবার কবি মুসলিম সংস্কৃতির চর্চা প্রবন্ধে দেখিয়েছেন, হিন্দু যেমন আরবি-ফারসি-উর্দু জানে না, তেমনি সাধারণ মুসলমান বাংলাও ভালো করে আত্মস্থ করে না, সেখানে আরবি-ফারসি শিক্ষার প্রশ্ন অবান্তর। প্রিন্সিপাল ইব্রাহীম খাঁকে লিখিত একটি পত্রে নজরুল জানিয়েছেন- 'হিন্দু-মুসলমানের পরস্পরের অশ্রদ্ধা দূর করতে না পারলে যে, এ পোড়া দেশের কিছু হবে না...।' সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির জন্য নজরুল সাহিত্য পাঠের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিলেন। কোনো সম্প্রদায়ের সমাজে তিনি মানুষকে বন্দি করেননি। শৃঙ্খলিত-নিপীড়িত মানুষের সংগ্রাম, হতভাগ্যের জাগরণ, পদানত-শোষিত মানুষের মুক্তি-প্রত্যাশায় তিনি মানুষকে জাতি-ধর্ম-সমাজ মন্দির-মসজিদ ও গ্রন্থের ঊর্ধ্বে তুলে ধরেছেন, মানবতার সপক্ষে বাজিয়েছেন সাম্যের সুরধ্বনি। ১৯২৬ সালে হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গার সময় অসাম্প্রদায়িক চেতনায় বিশ্বাসী নজরুলের হৃদয়-উৎসারিত বাণী হলো- 'যিনি সকল মানুষের দেবতা, তিনি আজ মন্দিরের কারাগারে, মসজিদের জিন্দাখানায়, গীর্জার মধ্যে বন্দী। মোল্লা-পুরুত, পাদরী-ভিক্ষু জেল-ওয়ার্ডের মত তাহাকে পাহারা দিতেছে। আজ শয়তান বসিয়াছে স্রষ্টার সিংহাসনে।... মানুষের কল্যাণের জন্য ঐ-সব ভজনালয়ের সৃষ্টি, ভজনালয়ের মঙ্গলের জন্য মানুষ সৃষ্টি হয় নাই। আজ যদি আমাদের মাতলামির দরুন ঐ ভজনালয়ই মানুষের অকল্যাণের হেতু হইয়া উঠে- যাহার হওয়া উচিত ছিল কল্যাণের। সেহেতু ভাঙিয়া ফেল ঐ মন্দির-মসজিদ!' (মন্দির ও মসজিদ)

ধর্মের ব্যাপারে নজরুল ছিলেন উদার। ড. আহমদ শরীফ লিখেছেন- 'নজরুল ইসলাম কোন বিশেষ ধর্মের অনুসারী ছিলেন বলা যায় না। তিনি দেশ জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষকে সমান উদারতায় ভালবাসতে পেরেছেন।' (বিচিত্র-চিন্তা) এক ধর্মের সত্য-সন্ধানীরা অন্য ধর্মকে ঘৃণা করতে পারে না বলে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেছেন। মুসলমান সমাজে সচেতনতা সৃষ্টির জন্য তাঁর আন্তরিকতার প্রকাশ রয়েছে 'আমার লীগ কংগ্রেস' প্রবন্ধে। নজরুল তাঁর এক ভাষণে বলেছিলেন, 'কেউ বলেন, আমার বাণী যবন, কেউ বলেন, কাফের। আমি বলি ও দুটোর কিছুই নয়'। অসাম্প্রদায়িক চেতনায় উদ্বোধিত নজরুল হিন্দু-মুসলিম মিথকে একইসঙ্গে প্রবন্ধের বক্তব্যে ব্যবহার করেছেন। যেমন-ক) আজ নারায়ণ আর ক্ষীরোদসাগরে নিদ্রিত নন। (নবযুগ) খ) ঐ শোনো মুক্তিপাগল মৃত্যুঞ্জয় ঈশানের মুক্তি-বিষাণ। ঐ শোনো মহামাতা জগদ্ধাত্রীর শুভ-শঙ্খ। ঐ শোনো ইসরাফিলের শিঙায় নব সৃষ্টির উল্লাস ঘন রোল! (নবযুগ)। এ সম্পর্কে কবি লিখেছেন- 'আমি হিন্দু-মুসলমানের পরিপূর্ণ মিলনে বিশ্বাসী; তাই তাদের এ সংস্কারে আঘাত হানার জন্যই মুসলমানী শব্দ ব্যবহার করি, বা হিন্দু দেব-দেবীর নাম নিই। অবশ্য এর জন্য অনেক জায়গায় আমার কাব্যের সৌন্দর্যহানি হয়েছে। তবু আমি জেনেশুনেই তা করেছি।'

বস্তুত বিশশতক জুড়ে হিন্দু-মুসলমানে দিনরাত হানাহানি, জাতিতে জাতিতে বিদ্বেষ, যুদ্ধবিগ্রহ, মানুষের জীবনে একদিকে কঠোর দারিদ্র্য, ঋণ, অভাব; অন্যদিকে লোভী মানুষের ব্যাংকে কোটি কোটি টাকা পাষাণস্তূপের মতো জমা হয়ে থাকা- এই অসাম্য, এই ভেদজ্ঞান দূর করতেই নজরুল বাংলা সাহিত্যে আবির্ভূত হয়েছিলেন; কবিতা ও প্রবন্ধে সাম্য, কল্যাণ ও ঐক্যের বাণী শুনিয়েছিলেন। নজরুলের অসাম্প্রদায়িক চেতনা প্রতিষ্ঠার সেই প্রচেষ্টাকে স্মরণে রেখে, অনুশীলন করে একুশ শতকে সামনে এগিয়ে যেতে হবে। গড়ে তুলতে হবে সাম্যবাদী সমাজ।

লেখক: বঙ্গবন্ধু গবেষক এবং বিশিষ্ট লেখক, কবি, কলামিস্ট এবং অধ্যাপক ও চেয়ারম্যান, বাংলা বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়

গণসম্প্রচারের ইতিবৃত্ত (১৯২২ থেকে ১৯৯২ খ্রিস্টাব্দ): বাংলাদেশ প্রেক্ষিত (২য় পর্ব)

দেওয়ান মোহাম্মদ আহসান হাবীব

ভারতীয় উপমহাদেশে বেতার শ্রোতার পরিধি প্রসঙ্গে লিওনেল ফিল্ডেন ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দে 'প্রগ্রেস অব ব্রডকাস্টিং ইন ইন্ডিয়া' শীর্ষক প্রতিবেদনে লেখেন যে, ১৯৩২ থেকে ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দে ভারতীয় উপমহাদেশে বেতার যন্ত্রের লাইসেন্সকৃত গ্রাহকের সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পেতে থাকে। ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দের শেষ দিকে ভারতে লাইসেন্সধারী শ্রোতার সংখ্যা ছিল ১০,৮৭২ জন। এক বছর পর ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দের শেষ দিকে এই সংখ্যা দাড়ায় ১৬,১৭৯ জন। ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দ সময়কালে বোম্বে এবং কলকাতা বেতার কেন্দ্র থেকে প্রচারিত বেতার অনুষ্ঠানের মানে দৃষ্টিনন্দন এবং উল্লেখযোগ্য কোনও পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়নি। তবে, বিবিসি এম্পায়ার সার্ভিস ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দের ১৯ ডিসেম্বর চালু হয়। সম্ভবত এর প্রভাবেই ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দের লাইসেন্স গ্রাহকের সংখ্যা প্রায় ৮,০০০ থেকে ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দে তা প্রায় ১৬,০০০-এ গিয়ে পৌঁছায়। বৃদ্ধির এই প্রবণতা পরবর্তী বছরগুলিতে সমান তালে পরিলক্ষিত হয়। ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দের শেষ অবধি লাইসেন্সধারী শ্রোতার সংখ্যা দাঁড়ায় ২৫,০০০ জন, ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দের শেষ অবধি লাইসেন্সধারী শ্রোতার সংখ্যা দাঁড়ায় ৩৮,০০০ জন এবং ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দের শেষ অবধি লাইসেন্সধারী শ্রোতার সংখ্যা দাঁড়ায় ৫০,০০০ জন। লিওনেল ফিল্ডেনের মতে, বিবিসি'র এম্পায়ার সার্ভিসের অনুষ্ঠান শুনার জন্য ভারতে বসবাসকারী ইউরোপিয়ানরা ব্যাপক সংখ্যায় রেডিও সেট ক্রয় করেন, যা লাইসেন্স সংখ্যার দ্রুত বৃদ্ধিতে একটি ইতিবাচক প্রবণতা রেখার সূত্রপাত ঘটায়।

ভারতবর্ষে ১৯৩২ থেকে ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বেতার সেটের বিক্রির প্রবণতা দেখে মিডিয়া গবেষক জিতিন (১৯৯৯) বলেন, বিবিসি'র এম্পায়ার সার্ভিসের আর্বিভাব আইএসবিএস-এর জন্য কিছু অতিরিক্ত গ্রাহক সৃষ্টি করেছে ঠিকই কিন্তু এটি প্রতিষ্ঠানটির শহুরে শ্রোতা আধিক্যের সমীকরণে কোনও পরিবর্তন আনতে পারেনি। আইএসবিএস তাই আগাগোড়াই এলিট লিসেনারদের লিডারশিপ দ্বারা প্রভাবিত ছিল। এটি মাস লিসেনার লিডারশিপের প্রতি বিন্দুমাত্রও সরণ ঘটাতে পারেনি। অথবা বলা যেতে পারে, গণমুখী প্রতিষ্ঠানে ধাবিত হওয়ার সুযোগ আইএসবিএস শীর্ষক প্রতিষ্ঠানে এযাবৎ সৃষ্টি হয়নি। তার বর্ণনা অনুসারে, সম্প্রচারের মডেলে 'পাবলিক সার্ভিস' কনসেপ্ট এখানে মুখ্য হয়ে উঠেনি, যতটা হয়েছিল ব্রিটেন এবং ইউরোপে। ভারতীয় উপমহাদেশে বেতার যন্ত্র থেকে ব্যবসায়িক মুনাফা অর্জন, সমগ্র ভারতে ব্রিটিশ রাজ টিকিয়ে রাখাসহ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন মিত্রশক্তির 'প্রচারণা' কার্যক্রমের প্রতি ছিল শীর্ষ অগ্রাধিকার। অনেকটাই উদ্দেশ্যমূলক সম্প্রচার বলা যেতে পারে। লিওনেল ফিল্ডেন ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ভারতের কন্ট্রোলার অব ব্রডকাস্টিং হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ভারত ত্যাগকালে নিজের অনুভূতি বর্ণনা করে লিখেন, "চার বছরের অক্লান্ত পরিশ্রমে মাত্র ১৪টি ট্রান্সমিটার স্থাপন করা সম্ভব হয়েছিল। ভারতের মতো চল্লিশ কোটি জনসংখ্যার দেশে এইসময়ে মাত্র পঁচাশি হাজার বেতার সেট বিক্রি করা সম্ভব হয়েছিল। বিষয়টি ফিল্ডেনের জন্য অত্যন্ত হতাশাজনক

ছিল। শুধুমাত্র পরিসংখ্যানগত কারণেই নয়, বরং ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দের ভারতের শহরকেন্দ্রিক সম্প্রচার ম্যাপও (চিত্র-১) ছিল তার হতাশার অন্যতম কারণ।

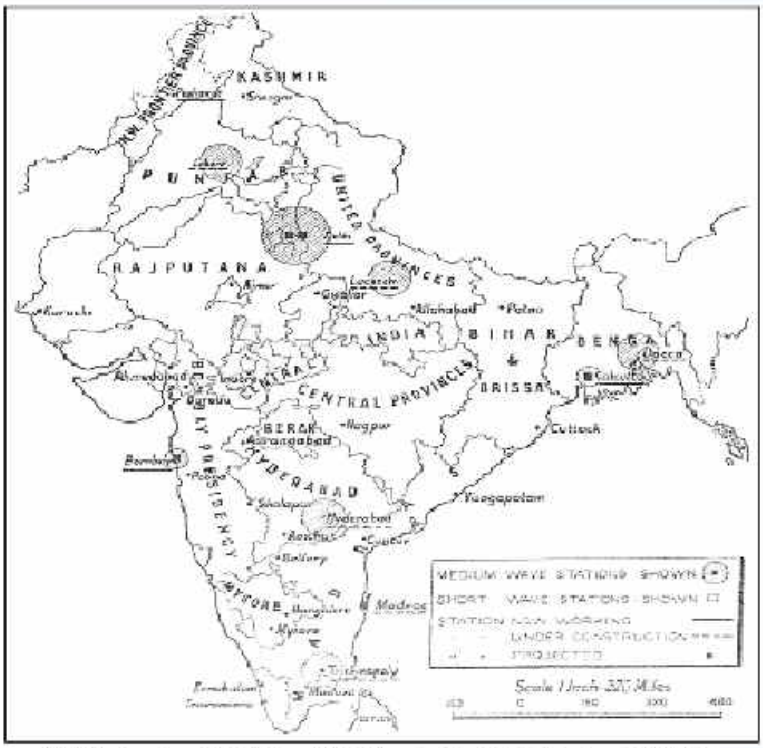

চিত্র-১: ভারতের ব্রডকাস্টিং স্টেশনের চেইন (প্রকৃত এবং সম্ভাব্য) এবং কাভারেজ এরিয়া ১৯৩৭ (সূত্র: জ্যেলজায়ার পিনকার্টেন-২০০৮)

নিজের আত্মজীবনী 'দ্যা ন্যাচারাল বেন্ট' (১৯৬০) পুস্তকে লিওনেল ফিল্ডেন বিষয়টিকে তৎকালীন ভারত সরকারের একটি 'স্টুপিডিটি' হিসেবে অভিহিত করেন। ফিল্ডেনের মতে ১৯৩৫ থেকে ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দ ছিল ব্রিটিশ ভারতের ইতিহাসে সবচেয়ে উত্তেজনাকর এবং অবাধ্য সময়। এই সময়টিতে ভারত সরকার ছিল 'জুয়েল ইন দ্যা ব্রিটিশ ইম্পেরিয়াল ক্রাউন'-এর রক্ষক। ভারত সরকার রাজনৈতিক এবং সামাজিক অফুরন্ত সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও কৃচ্ছ্রতাকে প্রাধান্য দিয়ে সময়ের সবচেয়ে আধুনিক উদ্ভাবন বেতার সম্প্রচারকে ভারতরাজ কিংবা ভারতীয় জনগণের স্বার্থে কৌশলী ব্যবহারে ব্যর্থতার পরিচয় দেয়। যদিও তখন অল ইন্ডিয়া রেডিও নামটির মাধ্যমে আইএসবিএস নতুন নামে ভারতে পরিচিতি লাভ করতে শুরু করেছে। অল ইন্ডিয়া রেডিও নিজস্ব যাত্রায় শুরু থেকেই প্রচারের কনটেন্ট-এর সম্পাদকীয় স্বাধীনতা নিয়ে বিভ্রান্ত থেকেছে। ফিল্ডেন-এর বর্ণনায়, "১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দের দিকে অল ইন্ডিয়া রেডিও এবং ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস- এক অভ্যন্তরীণ মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্বে জড়িয়ে পড়ে।" অল ইন্ডিয়া রেডিও পরিচালিত হতো শিল্প ও শ্রম মন্ত্রণালয়ের আওতাধীনে। ভারতের রাজনৈতিক এবং সামাজিক উত্তেজনাপূর্ণ টালমাটাল অবস্থার কারণে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং শিল্প ও শ্রম মন্ত্রণালয় চাইত না রেডিওতে এমন কিছু প্রচারিত হোক যাতে স্বাধীনতাকামী ভারতবাসী স্বাধীনতার পথে আরো উদ্দীপিত হয়। রাজনৈতিক ডামাডোলের কারণে বেতারের তাৎক্ষণিক এবং দ্রুত বার্তা বিতরণের অপূর্ব সক্ষমতাকে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় শংকাজনক বিবেচনা করত। উপরন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর ভারতে কৃচ্ছ্রতা সাধনকে অগ্রাধিকার দিতে গিয়ে বেতার সম্প্রচার কেন্দ্রগুলোর কাভারেজ এরিয়া ছিল মূলত শহরকেন্দ্রিক, যার ফলে সমগ্র ভারতের বিশাল জনগোষ্ঠী বেতার সম্প্রচারের বাইরে রয়ে গিয়েছিল। ফিল্ডেনের বর্ণনায়, "১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দের শেষ দিকে অল ইন্ডিয়া রেডিও এবং ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস-এর মধ্যকার অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব চরম আকার ধারণ করে। ফলাফলস্বরূপ, অল ইন্ডিয়া রেডিও থেকে প্রচারিত অনুষ্ঠানের বিষয়বস্তুতে সতর্কতামূলক সম্পাদকীয় শর্ত যুক্ত হয়। রাজনৈতিক বার্তা নিষিদ্ধ হয়। রাজনৈতিক দলের কর্মী সমর্থকদের সম্প্রচার কার্যক্রমে অংশগ্রহণ অলিখিতভাবে একেবারেই নিষিদ্ধ ছিল।"

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শুরুতে ইউরোপ জুড়ে নাৎসি বাহিনীর তাণ্ডবে বৃটিশ সাম্রাজ্য চরম সংকটের মুখে পড়ে। এ অবস্থায় জার্মান বেতার থেকে প্রতিনিয়ত ইংরেজ সৈন্যদের বিপর্যয় ও পরাজয়ের খবর অত্যন্ত ফলাও করে প্রচার করা হতে থাকে। পরিস্থিতি সামাল দিতে ভারত সরকার ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের স্বার্থ আর প্রয়োজন মোকাবেলায় এবং একই সাথে নাৎসি প্রচারণা প্রতিরোধে করাচি, লক্ষ্ণৌ, লাহোর, পেশোয়ার, তিরুচি এবং ঢাকায় ছয়টি মিডিয়াম ওয়েভ বেতার কেন্দ্র দ্রুত চালু করার সিদ্ধান্ত নেয়। এরই ধারাবাহিকতায়, ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দের ১৬ ডিসেম্বর ঢাকার নাজিমউদ্দিন রোডে একটি ভাড়া করা বাড়িতে (বর্তমানে এটি শেখ বোরহানউদ্দিন কলেজ) দুটি স্টুডিও নিয়ে ঢাকা বেতার কেন্দ্রের সম্প্রচার কার্যক্রম শুরু হয়। প্রথমে নামকরণ করা হয় 'ঢাকা ধ্বনি বিস্তার কেন্দ্র'। পরবর্তীতে নামকরণ করা হয় 'অল ইন্ডিয়া রেডিও, ঢাকা'। ঢাকা বেতারের ট্রান্সমিটার বসানো হয়েছিল বর্তমান কল্যাণপুরে। এটি ছিল রেডিও কর্পোরেশন অব আমেরিকার তৈরি মাত্র পাঁচ কিলোওয়াট শক্তিসম্পন্ন। এর মাধ্যমে ৪০ থেকে ৫০ মাইল ব্যাসার্ধের অঞ্চল পর্যন্ত অনুষ্ঠান শোনা যেত। প্রথম পরিচালক হিসেবে নিযুক্ত হয়েছিলেন ড. অমূল্য চন্দ্র সেন। তিনি ছিলেন প্রাচীন ভারতের ইতিহাসের ডক্টরেট। প্রথম দিনের অনুষ্ঠান উপস্থাপনায় ছিলেন ত্রিলোচন বাবু। তিনিই প্রথম মাইক্রোফোনে ঘোষণা করেন, 'ঢাকা ধ্বনি বিস্তার কেন্দ্র'।

ঢাকা বেতারের অনুষ্ঠান প্রযোজনা করার জন্য কলকাতা বেতার কেন্দ্র থেকে ১৯৩৯

খ্রিস্টাব্দে চারজন প্রোগ্রাম অ্যাসিসটেন্টকে বদলি করে আনা হয়েছিল। এরা হলেন প্রভাত মুখার্জি, শামসুর রহমান, সুনীল বোস এবং সুদেব বসু। পরবর্তীতে, অনুষ্ঠান প্রযোজক শামসুর রহমান তার 'চল্লিশ বছর আগের ইতিহাস' শীর্ষক রচনায় লিখেছেন, "সেসময়ে, এই উপমহাদেশে, বাংলাদেশ-পাকিস্তান-ভারতে কেবলমাত্র কলকাতা, দিল্লী, মাদ্রাজ ও বোম্বেতে চারটি বেতার স্টেশন ছিল।" তিনি আরো লিখেন,"...বেতার বিভাগ ছিল ব্যয়বহুল বিলাসিতার সামিল। কিন্তু বৃটিশ সাম্রাজ্যের নিজস্ব স্বার্থে আর প্রয়োজনে ভারত সরকারকে এই ব্যয়বহুলতা এই বিলাসিতার ব্যয়ভার বহন করতে হতো। উদ্দেশ্য, আনন্দ বিতরণের মিষ্টি মোড়কে করে এই উপমহাদেশের লোকদের ব্রিটিশ শাসনের গুণমানের পিল গেলানো।" শামসুর রহমানের মতে, "ঢাকা স্টেশনের জন্য ১৯৩৯-এর মাঝামাঝির কিছু আগে ২১ নং স্যার নাজিমুদ্দিন রোডে, খান বাহাদুর নাজিরউদ্দিন সাহেবের দোতলা বাড়িটা স্টুডিওর জন্য ভাড়া নেয়া হলো। রিসিভিং সেন্টার আর ট্রান্সমিটারের জন্যও মনিপুর আর মিরপুরে জমি বরাদ্দ নেয়া হল।" ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দের ১৬ ডিসেম্বর ঢাকা বেতারের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান সম্পর্কে তিনি লিখেছেন, "১৬ই ডিসেম্বর-এর যে উদ্বোধনী অনুষ্ঠান আমরা রচনা করেছিলাম তার শুরু হয়েছিল ভগবত গীতা পাঠ, কোরআন তেলাওয়াত, ত্রিপিটক পাঠ ও বাইবেল পাঠ দিয়ে। উদ্বোধনী সঙ্গীত নির্বাচন করা হয়েছিল রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত 'জনগণ মন অধিনায়ক' গানটি। সঙ্গীত আলেখ্য কাজী নজরুল ইসলামের 'পূর্বাণী' কেবলমাত্র ঢাকা বেতার কেন্দ্রের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের জন্য বিশেষভাবে রচিত হয়েছিল। নাটক বুদ্ধদেব বসুর 'কাঠ ঠোকরা'। ছোটদের অনুষ্ঠান 'খেলাঘর'-এ সঙ্গীত পরিবেশনের জন্য ছিল তখনকার শিশুশিল্পী লায়লা আর্জুমান্দ বানু। পল্লী অনুষ্ঠান 'গ্রামের পথে'-এর পরিকল্পনা করা হলো, যেন গ্রামের পথ দিয়ে যেতে যেতে পল্লীর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, তার দুরবস্থা, তার উন্নয়নের ব্যবস্থা আলোচনা চলছে, তারপর গ্রামের এক 'তরজা' ও কবিগানের আসরে হাজির হওয়া- এই ভাবে। ...তারপর এলো প্রতীক্ষিত উদ্বোধনের দিনটি, ১৬ই ডিসেম্বর। বিশ্বযুদ্ধের ডামাডোলে কোনো আড়ম্বর হয়নি। কোনো মঞ্চসজ্জা করা হয়নি। কোন সামিয়ানাও পর্যন্ত টানানো হয়নি। কোনো হোমড়া চোমড়া সেদিন এর উদ্বোধন করতে আসেননি। সম্পূর্ণ এক অনাড়ম্বর পরিবেশে ৪০ বছর আগে ১৬ই ডিসেম্বর ঢাকা বেতারের উদ্বোধন-অকালবোধন আমরা নিজেরাই করেছিলাম।"

১৯৬৩ খ্রিস্টাব্দে ঢাকার শাহবাগে তৎকালীন ঢাকা আঞ্চলিক বেতার কেন্দ্র ভবন

ঢাকা বেতারের প্রথম দিনের প্রথম সংগীত শিল্পী ছিলেন ওস্তাদ গুল মোহাম্মদ, উৎপলা ঘোষ (পরবর্তীকালে উৎপলা সেন), কল্যাণী দাস (কল্যাণী মজুমদার) প্রমুখ। প্রথম দিনের শিশুশিল্পী ছিলেন লায়লা আর্জুমান্দ বানু, অঞ্জলি ও রেবা নামের তিনজন শিশুশিল্পী। বুদ্ধদেব বসুর লেখা 'কাঠ ঠোকরা' নাটকই ঢাকা বেতার কেন্দ্র থেকে প্রচারিত প্রথম নাটক। ঢাকা বেতারের প্রথম মহিলা সংগীত শিল্পী হিসেবে ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দে তালিকাভুক্ত হন লায়লা আর্জুমান্দ বানু। ১৯৪৪ খ্রিস্টাব্দে তালিকাভুক্ত ঢাকা বেতারের প্রথম মহিলা নাট্য শিল্পী লতিকা রশিদ (হিলালী)।

১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের ১৪ আগস্ট ভারতবর্ষ থেকে ব্রিটিশ শাসনের অবসান এবং স্বাধীন রাষ্ট্র পাকিস্তানের অভ্যুদয় ঘটে। ১৩ আগস্ট দিবাগত রাত ১২.০০ টায় ঘোষক নাজির আহমেদ-এর কণ্ঠে ঘোষিত হয়: "পাকিস্তান ব্রডকাস্টিং সার্ভিস, ঢাকা। শুরু হল নতুন এক যুগের"। পাকিস্তানের একটি আঞ্চলিক বেতার কেন্দ্র হিসেবে ঢাকা বেতারের প্রথম নামকরণ হলো 'পাকিস্তান ব্রডকাস্টিং সার্ভিস, ঢাকা'। ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে পুনরায় নামকরণ হলো 'রেডিও পাকিস্তান, ঢাকা'। রেডিও পাকিস্তানের প্রথম মহাপরিচালক জুলফিকার আলী বোখারি। দেশ বিভাগকালে ভারতে প্রতিষ্ঠিত বেতার কেন্দ্রের সংখ্যা ৬টি (দিল্লি, বোম্বে, কলকাতা, মাদ্রাজ, তিরুচিরাপল্লী, এবং লাখনৌ) এবং তৎকালীন পাকিস্তান রাষ্ট্রে বেতার কেন্দ্রের সংখ্যা ৩টি (পেশোয়ার, লাহোর এবং ঢাকা)। অল ইন্ডিয়া রেডিও ঢাকার সর্বশেষ এবং রেডিও পাকিস্তান, ঢাকার প্রথম পরিচালক: জি কে ফরিদ। মেয়াদ কাল ছিল ১০ মে ১৯৪৭ থেকে ২০ অক্টোবর ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত। প্রোগ্রাম অ্যাসিসটেন্ট শামসুর রহমান, সাদেকুর রহমান, সৈয়দ আলী আহসান, শামসুল হুদা চৌধুরী, আমিরুজ্জামান খান, নাজির আহমেদ। এদের সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টা, উদ্যম আর ঐকান্তিক প্রয়াসে এ অঞ্চলের শিল্পীরা এগিয়ে এলেন। অবিভক্ত ভারতবর্ষের কলকাতায় যারা গান গাইতেন, শিল্পী হিসেবে যাদের জনপ্রিয়তা ও খ্যাতি ছিল তাদের মধ্যে মুসলমানরা অধিকাংশই চলে এলেন পূর্ব বাংলায়। আশরাফ-উজ-জামান খান ছিলেন কলকাতা বেতারের প্রোগ্রাম অ্যাসিসটেন্ট। প্রোগ্রাম এক্সিকিউটিভ হিসেবে তিনি চলে এলেন ঢাকা বেতারে। প্রোগ্রাম অ্যাসিসটেন্ট হিসেবে ঢাকা বেতারে অন্যান্য যারা চাকুরি করেছেন তাদের মধ্যে

ঢাকা বেতারের প্রথম দিনের প্রথম সংগীত শিল্পী ছিলেন ওস্তাদ গুল মোহাম্মদ, উৎপলা ঘোষ (পরবর্তীকালে উৎপলা সেন), কল্যাণী দাস (কল্যাণী মজুমদার) প্রমুখ। প্রথম দিনের শিশুশিল্পী ছিলেন লায়লা আর্জুমান্দ বাণু, অঞ্জলি ও রেবা নামের তিনজন শিশুশিল্পী। বুদ্ধদেব বসুর লেখা 'কাঠ ঠোকরা' নাটকই ঢাকা বেতার কেন্দ্র থেকে প্রচারিত প্রথম নাটক। ঢাকা বেতারের প্রথম মহিলা সংগীত শিল্পী হিসেবে ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দে তালিকাভুক্ত হন লায়লা আর্জুমান্দ বাণু। ১৯৪৪ খ্রিস্টাব্দে তালিকাভুক্ত ঢাকা বেতারের প্রথম মহিলা নাট্য শিল্পী লতিফা রশিদ (হিলালী)।

উল্লেখযোগ্য হলেন কবি শামসুর রাহমান, আবুল কালাম শামসুদ্দীন, সৈয়দ জিল্লুর রহমান, নাজমুল আলম প্রমুখ।

নাজির আহমেদ ঢাকা বেতার কেন্দ্রের গোড়াপত্তনের সময় থেকেই নাট্যশিল্পী ছিলেন। ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দে তিনি ঢাকার প্রোগ্রাম অ্যাসিসট্যান্ট হিসেবে কাজ শুরু করেন। বেতার কর্মকর্তা মুস্তাফা নূরউল ইসলাম 'বেতার কাহিনী' নিবন্ধে লিখেছেন, "রেডিও'র অনুষ্ঠান সংগঠক, উপস্থাপক নাজির আহমেদ নামজাদা ব্রডকাস্টার ছিলেন। তিনি একসময় নিয়মিত আকাশবাণীতে সংবাদ পড়তেন। অভিজ্ঞতায় কৃচিৎ শুনেছি অমন পরিশীলিত কণ্ঠ"। নাজির আহমেদ ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দে লন্ডন চলে যান এবং বিবিসি'র বাংলা অনুষ্ঠানের দায়িত্ব লাভ করেন। কিছুদিন পর তিনি আবার দেশে ফিরে আসেন। পূর্ববঙ্গ সরকার তাঁকে চলচ্চিত্র বিভাগ গঠন করার দায়িত্ব দেন। ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দে পূর্ব পাকিস্তানের প্রথম প্রামাণ্য চলচ্চিত্র 'আলামত' নির্মাণ করেন। ছবিটি সেলময়ে খুবই প্রশংসিত হয়েছিল। ফিল্ম ডিভিশনের কাজ গুছিয়ে দেবার পর তাঁকে দায়িত্ব দেয়া হয় একডিসি স্টুডিও পরিকল্পনা ও নির্মাণের। ঢাকার তেজগাঁয় বর্তমানে যে একডিসি স্টুডিও রয়েছে সেটা নাজির আহমেদের হাতেই প্রতিষ্ঠিত। ১৯৬২ খ্রিস্টাব্দে তিনি শেষবারের মত দেশ ত্যাগ করেন এবং লন্ডনই হয়ে উঠেছিল তার আমৃত্যু স্থায়ী ঠিকানা।

পঞ্চাশের দশকে রেডিও পাকিস্তানের কোন উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন ট্রান্সমিটার ছিল না। সে কারণে পাকিস্তানের সকল রেডিও স্টেশন থেকেই আলাদাভাবে খবর প্রচার করা হতো। পরবর্তীতে, করাচিতে শক্তিশালী শর্টওয়েভ ট্রান্সমিটার স্থাপন করা হলে ঢাকার বার্তা বিভাগকে করাচি নিয়ে যাওয়া হয় এবং করাচি থেকে রিলের মাধ্যমে ইংরেজি, বাংলা ও উর্দু ভাষায় ন্যাশনাল নিউজ বুলেটিন বা জাতীয় সংবাদ প্রচার শুরু করা হয়। করাচি থেকে বাংলা সংবাদ পাঠকরূপে ফতেহ লোহানী, মুজিবর রহমান, নুরুল ইসলাম সুপরিচিতি লাভ করেছিলেন।

সেই সময়ে বেতার সম্প্রচারের বিশ্বাসযোগ্যতা এবং গ্রহণযোগ্যতা প্রশ্নে দুটি উদাহরণ তুলে ধরা যেতে পারে। বেতার ব্যক্তিত্ব ফজল-এ-খোদা 'আমার চেতনে রেডিও' শীর্ষক স্মৃতিচারণমূলক নিবন্ধে লিখেছেন, "সেই ১৯৫৪ সালে রেডিওর ভাবমূর্তি ছিল পাহাড়প্রমাণ। তখন রেডিও'র কথা লোকে অন্ধভাবে বিশ্বাস করত। দেশে দারুণ খরা। বৃষ্টি হচ্ছে না। মাঠের ধান, পাট পুড়ে যাচ্ছে। কৃষকেরা বৃষ্টির জন্য মাঠের মধ্যে গিয়ে নামাজ আদায় করছে। ঠিক এরকম দিনে রেডিওতে আবহওয়া বার্তায় ঘোষণা করা হল, আজ-কালের মধ্যে ঘন বর্ষণ থেকে মাঝারি ধরনের বৃষ্টি হবে। তারপরই আব্বাস উদ্দিনের গান বাজল, 'আল্লাহ মেঘ দে পানি দে, ছায়া দেরে তুই, আল্লাহ মেঘ দে'। সেদিন রাতেই এমন বৃষ্টি হল যেন আকাশ ভেঙে পড়ল। বৃষ্টিতে সয়লাব হয়ে গেল মাঠ, ঘাট, বট। তখন মানুষের মুখে মুখে এক কথা। রেডিও মিথ্যে বলে না। আমরা তখনই জানি। রেডিও যখন বলেছে তখন বৃষ্টি হবেই। তখন রেডিও সম্পর্কে মানুষের এরকমই বিশ্বাস ছিল। তার প্রধান কারণ হল, যৌক্তিক এবং নির্ভরযোগ্য না হলে রেডিও থেকে কোন তথ্য প্রচার করা হতো না। কিন্তু সেই ভাবমূর্তি নষ্ট হল আইয়ুব খানের শাসন আমল থেকে। তখন রেডিওতে প্রচার হতে থাকল তার শাসনে যা ঘটেছে বা হচ্ছে তা এশিয়ার সেরা, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম কাজ। এতো মিথ্যাচার রেডিওর প্রচারে অতীতে আর কখনো ঘটেনি। পরবর্তীতে, অবস্থা এমন হল, মানুষ গুজবকে বিশ্বাস করে কিন্তু রেডিওকে নিয়ে বিশ্বাস অবিশ্বাসের দোলায় দোলে।"

দ্বিতীয় ঘটনাটি সম্ভবত ১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দের। 'আমার উপস্থাপক জীবন' শীর্ষক আত্মজীবনীতে অধ্যাপক আব্দুল্লাহ আবু সায়ীদ লিখেছেন, "রেডিওতে তরুণ কবিদের একটা কবিতা পাঠের আসর হচ্ছে। আমি উপস্থাপক। নির্মলেন্দু গুণ কবিতা পড়েছেন সে আসরে। রেডিওতে সেই তাঁর প্রথম কবিতা পড়া। রেকর্ডিং শেষে অনুষ্ঠানটি কবে কখন রেডিওতে সম্প্রচার হবে জানার জন্য গুণ প্রযোজককে অস্থির করে তোলেন। তখনও অনুষ্ঠানটির প্রচার সময় ঠিক হয়নি, তাই প্রযোজকও সঠিক কিছু বলতে পারছেন না। কিন্তু গুণ (তাঁর) কবিতার ভাষায় 'উত্তেজিত ও উন্মাদ'। একেবারেই নাছোড়বান্দা। তীক্ষ্ণ গলায় শুধু প্রচারের দিনক্ষণ জানতে চাচ্ছেন। প্রযোজক বিরক্ত হয়ে বললেন, "অত জেনে হবেটা কি আপনার?" গুণ বললেন, "আপনি সেটা কী করে বুঝবেন? সময়টা যে বাবাকে আমার চিঠি লিখে জানাতে হবে। এ অনুষ্ঠান তাঁর শুনতেই হবে। এই রেডিও থেকে কবি জসীম উদ্দিনের গলা শোনা যায়। এ থেকে আমার গলা শোনা পেলেই তিনি বুঝবেন আমি কবি হয়েছি।"

লেখক: উপপরিচালক, বাংলাদেশ বেতার (বর্তমানে এনএইচকে অ্যার্ড, জাপানে নিয়োজে কর্মরত)

প্রবাল দ্বীপের হাতছানি

সৈয়দা তাসলিমা আক্তার

আমার ছোটবেলায় ভ্রমণ বলতে নানিবাড়ি আর খালার বাড়ি বেড়ানো এই পর্যন্তই, একটু বড় হওয়ার পর চাচাতো ভাই-বোনেরা যখন এদিক-ওদিক বাসা বাঁধলো তখন বেড়ানোর গণ্ডি সে অনুযায়ী বাড়লো। আমার জীবন পুরোটাই ঢাকা কেন্দ্রিক, শহর কেন্দ্রিক কিনা তা অবশ্য বিশ্লেষণের দাবি রাখে; কেননা বড়বেলায় যখন গ্রামে যাওয়ার সুযোগ এলো তখন অনেকটাই আমার ছোটবেলার ঢাকার আদল পাই। শহরের বাইরে যাওয়ার অভিজ্ঞতা তখনও অবধি ডেমরা আর গাজীপুর। ১৯৯২ সালের ফেব্রুয়ারিতে আক্ষরিক অর্থেই ঢাকার বাইরে যাওয়ার সুযোগ এলো, এশুধু শহর, জেলা বা বিভাগ নয় বরং আরো অনেকটা ছাড়িয়ে সেই দক্ষিণ সীমান্তে সুন্দরবনের পাশ ঘেঁষে ঝাপটি মেরে থাকা বাগেরহাটে; লক্ষ্যে পুরো দেড়দিনের যাত্রা। বেণী মাধব কবিতার মতো 'আমি তখন নবম শ্রেণি, আমি তখন ষোল'।

এরপর কেটে গেল বেশ কয়েকবছর, কলেজ আর বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসকে কেন্দ্র করে জীবন কাটছে জীবনের নিয়মে। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম বর্ষেই সুযোগ এলো কর্তৃপক্ষের তত্ত্বাবধানে শিক্ষা সফরে কক্সবাজার ও সেন্টমার্টিন যাওয়ার। শিক্ষা সফর বাধ্যতামূলক কো-কারিকুলারের মধ্যে না থাকার কারণে বাড়ি থেকে অনুমতি পাওয়া বেশ জটিল। মধ্যবিত্ত রক্ষণশীল পরিবারের ধরাবাঁধা নিয়ম আর সংগতির সীমাবদ্ধতাও এক্ষেত্রে অস্বীকার করার উপায় নাই, নিতান্তই অনন্যোপায় হয়েই এ সুযোগ ছেড়ে দিতে হয়েছিল। স্নাতক শেষবর্ষে এসে আবার যখন সুযোগ এলো সমুদ্র দর্শনের তখন সুযোগের সদ্ব্যবহার করতেই হবে এমন ভাবনা থেকেই শুরু হলো মা'কে রাজি করানোর প্রাণান্তকর চেষ্টা এবং অবশেষে মিলল অনুমতি- 'সাগরে যাবো আমরা, সাগরে যাবো ঐ সুনীল সাগরকে হৃদয়ে পাবো' সত্যি এবার শুধু দিন গোনা। ফেব্রুয়ারির প্রথম সপ্তাহে সম্ভবতঃ ৭ তারিখ যাত্রার দিন নির্ধারিত, দুই পার্বত্য জেলা বান্দরবান, রাঙামাটিসহ কক্সবাজার আর সেন্টমার্টিন যাওয়ার এক বিশাল পরিকল্পনার অংশী হয়েছিলাম আমরা, শিক্ষক-শিক্ষার্থীসহ মোট ৪০ জন।

২০০০ সালের ৭ ফেব্রুয়ারি রাতে আমরা ঢাকা থেকে কক্সবাজারের উদ্দেশ্যে রওনা হলাম।

জীবনে প্রথম পরিজন ছাড়া ভ্রমণ এবং আকাঙ্খিত সমুদ্র দর্শনের পথে, সত্যি বলতে এটাই ছিল আমার জন্য প্রথম কোন পর্যটন স্পটে পর্যটক হয়ে যাওয়া, কিঞ্চিৎ ভয় আর সীমাহীন উত্তেজনাকে সঙ্গী করে যাত্রা শুরু। রাতের ভ্রমণপথের দৃশ্যপট স্বাভাবিকভাবেই তেমন কোন স্মৃতি তৈরি করেনি, তবে ৪০ জনের একত্রে যাত্রা নিঃসন্দেহে উল্লেখযোগ্য ঘটনা। গান আর হাসি আনন্দে ক্লান্তিহীন যাত্রা। আমাদের সাথে দু'জন শিল্পীও ছিলো, জামালী আর রাদ, তারা কিন্তু তাদের গিটার নিতে ভুল করেনি, এছাড়া বন্ধু চুমকিও কিন্তু কম যায় না। গানে আর আড্ডায় রাত ভোর হয়, আমরা কলাতলী বিচ ঘেঁষে আমাদের হোটেলে যাওয়ার পথে সমুদ্রকে এক ঝলক দেখি, জীবনে প্রথম সমুদ্র দেখা, এই দেখাটা আমার কাছে এক অমলিন স্মৃতি।

ছোটবেলায় বই-এ পড়া আর মাঝে-সাঝে টিভি পর্দায় দেখা সমুদ্রকে যখন বাস্তবে দেখলাম তখন সত্যিই আমি ভাষাহীন, মুহূর্তে পৃথিবীর আর সব আয়োজন আমার কাছে খুব তুচ্ছ বলে মনে হলো (এ আমার কৈশোরউত্তীর্ণ সময়কার অনুভূতি)। সেসময় কলাতলী বিচ বেশ বহাল তবিয়তেই ছিলো, ছিলো না জনারণ্যে কোলাহলপূর্ণ স্রোত। তাই সমুদ্রস্রোতের একটানা গর্জন ছাড়া যেন বিশ্ব চরাচরে আর কোন শব্দের অস্তিত্ব ছিলো না।

ভোরের সমুদ্র দর্শন ছিলো আমার তরুণী জীবনে প্রথম সমুদ্র দর্শন, একই সাথে এ যাত্রার সমুদ্রস্নানও আমার জীবনে প্রথম সমুদ্র স্নান। তখনও পর্যন্ত মৌসুমী ভৌমিকের 'আমি শুনেছি সেদিন তুমি' গানটি শোনা হয়নি তবে এখন যখন শুনি মনে হয় আমি কবি হলে হয়তো আমার আকুতি এমনি হতো। আমার এ লেখাতে কক্সবাজার বালুকাবেলার রূপ-সৌন্দর্যের গুণগান খুব একটা থাকছে না। আসলে সমুদ্রের কথা বলতে গেলে আমি বরাবর বাচাল হয়ে যাই। কক্সবাজার বালুকাবেলা এবারকার মতো ছেড়ে যাচ্ছি, তবে সমুদ্রকে ছাড়ছি না বরং সমুদ্রবক্ষে গিয়ে তার উথাল-পাথাল মনের হদিস নেয়া যায় কিনা সে উদ্দেশ্যে টেকনাফ থেকে বিশাল জলরাশি পাড়ি দিয়ে সেন্টমার্টিনের পথে আমরা। সেসময় উত্তাল সমুদ্র পাড়ি দেওয়ার জন্য কেয়ারি বা সেন্টমার্টিন নামে কোন জলযান বা সি-ট্রাক ছিলো না, একটু বড় মাপের ইঞ্জিন নৌকাই ছিলো একমাত্র ভরসা।

টেকনাফ খাড়ি থেকে প্রথমে ছোট নৌকা করে একটু দূরে থাকা বড় ইঞ্জিন নৌকা উঠা অবধি তেমন কোন শঙ্কা কাজ করছিল না, টের পেলাম যখন ইঞ্জিন নৌকা চলতে শুরু করলো। আমরা মর্ত্যের পৃথিবী থেকে তো বিচ্ছিন্ন হয়েছিই তবে কতক্ষণ এই বিশাল জলরাশির সাথে পাল্লা দিয়ে ছোট এই নৌকা আমাদের নিয়ে ভেসে থাকতে পারবে সে বিষয়ে মনে বিরাট সংশয়। আপাতঃ বিশাল ইঞ্জিন নৌকাটি তখন নিতান্তই খোলামকুচি বলে মনে হচ্ছিল। শুরুর এই ধাক্কাটা আমরা অনেকেই কাটিয়ে উঠতে পারিনি। তাই সমুদ্রযাত্রার অবারিত রূপরস সুধা পান থেকে বঞ্চিত হয়েছি সন্দেহ নাই, আজ অবশ্য এই অকারণ ভয় নিয়ে একটু দুঃখবোধ কাজ করে। কেননা এরপর একাধিকবার সেন্টমার্টিন যাওয়া হলেও ইঞ্জিন নৌকায় আর যাওয়ার সুযোগ হয়নি। সময়টা তখন উপভোগ করতে পারলে বেশ একটা অ্যাডভেঞ্চারের শুছানো অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ে থাকতো, তা আর হলো না।

ঠিক কত সময় লেগেছিলো টেকনাফ থেকে সেন্টমার্টিন পৌঁছুতে তা মনে করতে পারছি না তবে সকাল-দুপুর পেরিয়ে তা বিকেল গড়িয়ে ছিল সন্দেহ নেই। মনে পড়ে আমরা যখন সেন্টমার্টিনে পৌঁছে কোনরকম ফ্রেশ হয়ে দুপুরের খাবার খাচ্ছিলাম তখন সূর্য তার দিনের পাট গুছাচ্ছিল। তবে সেবার সেন্টমার্টিন যাওয়ার পথে আমাদের জন্য বাড়তি পাওনা ছিলো শাহপরীর দ্বীপ ঘুরে যাওয়া। আমাদের নৌকাটি যখন শাহপরীর দ্বীপে নোঙর করলো তখন এক অভাবনীয় দৃশ্য আমরা অবাক হয়ে দেখলাম, যেন পুরোটা দ্বীপ জুড়ে লাল রঙের অজস্র ফুল ফুটে আছে। আবার ফুলগুলো কোথাও স্থির থাকছে না, আসলে এর আগে আমি লাল কাঁকড়া তো দেখিইনি এমনকি এর অস্তিত্ব সম্পর্কেই আমার কোন ধারণা ছিলো না; অন্যদের ছিলো কিনা আমার জানা নেই। পরে অবশ্য জেনেছি দ্বীপটি লাল কাঁকড়ার জন্য বিখ্যাত।

যেকোন প্রাতিষ্ঠানিক সফরের সময়ের একটা বাধ্যবাধকতা থাকে যেহেতু সেন্টমার্টিনে আমরা একটামাত্র রাত অবস্থান করবো তাই যাওয়ার পথেই আমরা ছেঁড়া দ্বীপে নামবো বলে কর্তৃপক্ষ সিদ্ধান্ত নিলেন, আমাদের অন্যমত হওয়ার কোন কারণ নেই। সেসময় ছেঁড়া দ্বীপ একটি ক্রেজ ছিল, সেন্টমার্টিনকে তো জানছি অনেক দিন থেকে, ছেঁড়া দ্বীপটি তখন সবেমাত্র পর্যটকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে, তাই পত্রিকার ভ্রমণপাতায় প্রায়ই ছেঁড়া দ্বীপের রূপসৌন্দর্যের বর্ণনা পাওয়া যেত। অতি আয়াসে ছেঁড়া দ্বীপ দেখার এ সুযোগ আমাদের কাছে অনেকটা মেঘ না চাইতে জল হয়ে ধরা দিল। ছেঁড়া দ্বীপের কাছাকাছি পৌঁছুতে না পৌঁছুতে আমাদের অতিউৎসাহী

কিছু অভিযাত্রীর আর তর সইলো না, মায়াবী জলের হাতছানিতে জলের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়লো যার খেসারতও দিতে হলো। ছেঁড়া দ্বীপটি তো আসলে মূল দ্বীপ থেকে প্রকৃতিক নিয়মে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া একটি অংশ যেখানে জনমানবের পদচিহ্ন খুব একটা না পড়ার কারণে প্রকৃতির স্বাভাবিক রূপ তখনও পর্যন্ত অটুট; যে কারণে দ্বীপ ঘেঁষে জলের তলার প্রবালগুলো অনেক বেশি সতেজ আর জীবন্ত। খেসারতটাও সেখানেই, জীবন্ত প্রবাল বেশ ধারালো হয়, তাই যারা জলের বুকে ঝাঁপ দিলো তারাই জলের তলার প্রবালে পা কেটে বসলো। ছেঁড়া দ্বীপে অজস্র কেয়া আর গোলপাতার সমাহার, আর সেবারই আমি দেখলাম গোলপাতা সত্যি সত্যিই গোল নয়।

সময়ের সাথে তাল মিলানোর প্রয়োজনে খুব বেশিক্ষণ ছেঁড়া দ্বীপে থাকার সুযোগ হয়নি, অল্পক্ষণের ঘুরাঘুরি আর কিছু ছবি স্মৃতি করে নিয়ে আমরা আমাদের মূল গন্তব্যের পথে রওনা হলাম। আগেই বলেছি আমরা সেন্টমার্টিন পৌঁছুতে পৌঁছুতে সময় তার গোধুলি লগ্নে পৌঁছে গেছে। সকালের নাস্তার পর সারাদিন কলা আর দু'একটা বিস্কিট ছাড়া তেমন কিছু জোটেনি, এতক্ষণ পথের উত্তেজনায় ক্ষুধা-তৃষ্ণার অনুভূতি ম্রিয়মান থাকলেও এইসময় এসে পেট জানান দিচ্ছে, বেশ জোরেসোরেই জানান দিচ্ছে। অগত্যা সবাই তার নিজ নিজ আস্তানা বুঝে নিয়ে কোনরকম চোখে-মুখে পানি দিয়ে রসনার খোঁজে নেমে এলাম। সেসময় পুরো সেন্টমার্টিন জুড়ে থাকার একমাত্র ব্যবস্থা ছিলো পর্যটনের অবকাশ হোটেল। যতদূর মনে পড়ে হোটেলের নিচে কোন ডাইনিং এর ব্যবস্থা ছিলো না, বরং বালিয়াড়ি ঘেঁষে একটি টিন আর বেড়ার একটি একচালা ঘরে আমাদের খাওয়ার আয়োজন ছিল, এটা কি অবকাশের তত্ত্বাবধানে ছিলো কিনা তা আমার জানা নেই।

সারাদিনের ধকল কিন্তু কম ছিলো না একেতো খোলা ইঞ্জিন নৌকায় উত্তাল সমুদ্র পাড়ি দেয়া, ভয় আর শঙ্কার পাশাপাশি তপ্ত জলরাশি আর সূর্যের যৌথ উত্তাপ সহ্য করাও

কম কথা না। সবাই কমবেশি ক্লান্ত। খাওয়া-দাওয়ার পর মন ভরে ঠান্ডা পানিতে গোসল করার জন্য সবাই একে একে লাইনে অপেক্ষমাণ, যেহেতু শিক্ষাসফর আয়োজন বাজেট ফ্রেন্ডলি হতে হয় সেক্ষেত্রে থাকার জন্য ডরমেটরিই কিন্তু উপযুক্ত ব্যবস্থা, সুতরাং লাইন থাকবেই। একে একে সবাই গোসল সেরে নিয়ে সময় মিলল বাইরে যাওয়ার কিন্তু অনুমতি মিলল না। তাই আপাততঃ বারান্দা থেকে সমুদ্র দেখা আর গর্জন শোনা এই নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে হলো। সেসময় আকাশে চাঁদের আকার বেশ বড়ই ছিলো, সময়টা পূর্ণিমা না হলেও বড়জোর দু'একদিন এদিক-সেদিক হবে। আমরা যখন সমুদ্রতটে নেমে এলাম তখন সন্ধ্যে যেন তরুণী রাত্রিকে আহ্বান করছে তার সময়টা বুঝে নিতে। ততক্ষণে সমুদ্রে ভরাজোয়ার আমরা ছোট ছোট দলে- কেউ সমুদ্রের ঢেউ পায়ে পায়ে ঠেলে হেঁটে বেড়াচ্ছে, কেউবা গোল হয়ে বসে আড্ডা দিচ্ছে, কারো কণ্ঠ ছেড়ে গান ছুটে চলেছে সমুদ্র পানে। আমি, চুমকি আর সাদিয়া হাঁটতে হাঁটতে একটি জায়গায় এসে নিশ্চুপ হয়ে সমুদ্রের ঢেউয়ের আসা যাওয়া দেখছি, তখনই সাদিয়া তার মিষ্টিকণ্ঠে গেয়ে উঠলো 'সাগরের তীর হতে কে যেন আমারে ডাকে...'।

রাতে ক্যাম্পফায়ারের ব্যবস্থা ছিল আড্ডা, গান আর যেমন খুশি তেমন বলার মধ্যদিয়ে রাত্রি তরুণী থেকে মাঝবয়সে পৌঁছে গেল আমরা রাতের আহারের মধ্য দিয়ে আমাদের সেদিনকার আয়োজন গোটালাম। যে যার আস্তানায় গিয়ে ঘুমের প্রস্তুতি নিলাম, কিন্তু এতো কাছ থেকে সমুদ্রের ডাক যেন পোড়া বাঁশির মতো আমাদের ঘুম কেড়ে নিল। কিছুক্ষণ এপাশ-ওপাশ করে শেষমেষ থাকতে না পেরে বারান্দায় বেরিয়ে এলাম, গর্জন শোনার সাথে সাথে সমুদ্রের ঢেউয়ের নাচন দেখবো বলে। কিন্তু একি ঘরের কাছে সমুদ্র কোন সে অভিমানে এতো দূরে- আসলে ততক্ষণে ভাটা শুরু হয়ে গিয়েছিল।

রাত্রিতে ঠিক কয়টায় ঘুমুতে গেলাম তা আর দেখা হয়নি, তবে বেশ রাত করে ঘুমুতে যাওয়ার পরও কিন্তু ঘুম ভেঙেছে সকাল সকাল। সকালের সমুদ্রের সাথে আলাপনটা যে বাকি রয়ে গেল। সকালের সমুদ্র সূর্যের রূপালি ছটায় ঝলমল করছিল, রূপাগোলা জলে পা ডুবিয়ে তট ধরে যতদূর পারা যায় হেঁটে চলাতেই সুখ। তবে চাইলেইতো সুখের সাগরে ডুবে থাকা যায় না- ফিরতি বাহন যে অপেক্ষায়। এরপর কেমন যে এক বুক শূন্যতাকে সাথী করে সকালের নাস্তা খেয়ে নিজস্ব বাক্স-প্যাঁটরা গুছিয়ে অতিযত্নে গড়া বালির ঘর ছেড়ে রওনা হলাম কোলাহলমুখর জনারণ্যের পথে...।

লেখক: উপপরিচালক, বাংলাদেশ বেতার

তরুপল্লব

শিশু-কিশোর পাতা

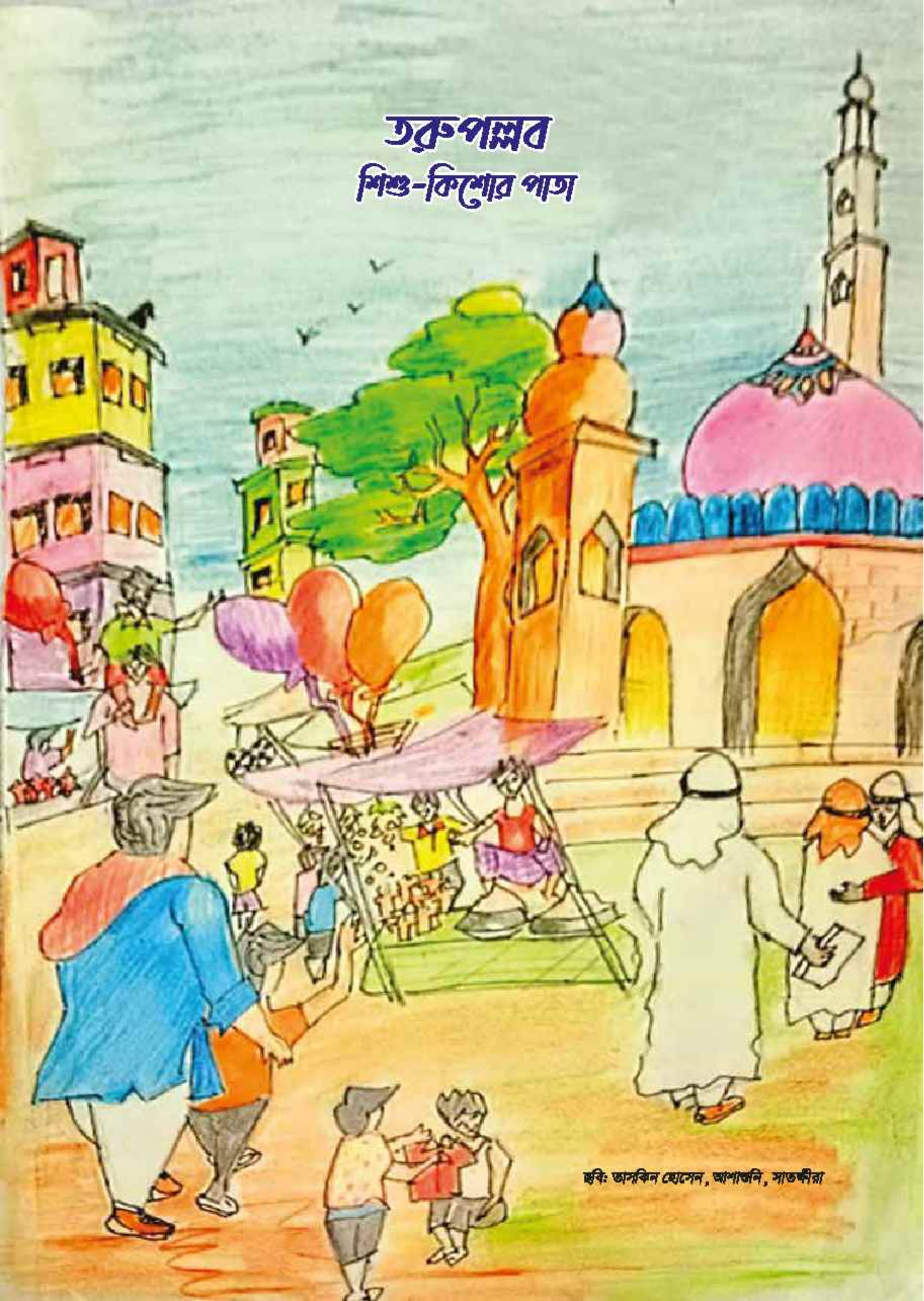

ছবি: তাসকিন হোসেন, আশাজনি, সাতক্ষীরা

এবার ইদে

মির্জা রিজওয়ান আলম

‘তুমি ওই ছেলেটাকে জামা দিতে গেছো কেন? - ওর নাকি কোনো নতুন জামা নেই। আজকে ঈদের দিনেও ও রাস্তার ধারে খালি গায়ে বসে ছিল। আমার তো সাতটা নতুন জামা। তাই আমি ওখান থেকে ওকে দুটো দিতে গেছিলাম। - ছি! ছি! তুমি দেখেছো ওরা কোন পরিবেশের মানুষ? তুমি আমাকে বলতে পারতে, আমি কিছু টাকা দিয়ে দিতাম। - কিন্তু এখন টাকা দিলেও নতুন জামা কি পাওয়া যাবে? - তাই বলে... ওর সাথে এত গুজগুজানি করতে তোমার একটুও রুচিতে বাঁধল না? - কিন্তু ওর তো কোনো নতুন জামা নেই। তাই আমি ওকে জামা দিতে গেছিলাম। স্কুলে আমাদের হুজুর স্যার বলেছে, আমাদের মহানবি (সাঃ) ঈদগাহ থেকে আসার সময় নিজের জামা খুলে দিয়ে এসেছিলেন একজনকে।’

আজকে সকাল থেকেই স্বপ্নীলের আনন্দের কোনো সীমা-পরিসীমা নেই। কারণ আজই তারা প্রথমবারের মতো ঈদ করতে গ্রামের বাড়িতে যাচ্ছে। স্বপ্নীলের বাবা একজন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা, মাও চাকরিজীবী। তাদের ব্যস্ততার কারণে এর আগে কোনো বছরের ঈদেই গ্রামে যাওয়া হয়নি, ঢাকা শহরেই কেটেছে সবগুলো ঈদ। আর এই নিয়েই স্বপ্নীলের এতো আনন্দ আর উত্তেজনা। গ্রামের বাড়িতে যাওয়ার ব্যাপারে মা ছিলেন ভালো-মন্দ দোটানার ভিতরে। ঈদ করতে গ্রামের বাড়িতে যাওয়ার সিদ্ধান্তটা মায়ের কাছে খুব একটা ভালো লাগেনি, কিন্তু দাদি অসুস্থ বলে বাবা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন এবারের ঈদটা গ্রামে গিয়ে কাটাবেন।

জিনিসপত্র সব গুছিয়ে ফেলা হলো। অবশেষে দুপুর ১২টার দিকে ওদের গাড়ি রওনা করলো গ্রামের বাড়ির উদ্দেশ্যে। গ্রাম ছিল স্বপ্নীলের কাছে রূপকথার মতো। গ্রাম দেখার সুযোগ পেয়ে সে তো রীতিমতো

আনন্দে আত্মহারা। চলতে চলতে বিকাল চারটার দিকে ওরা বাড়ি পৌঁছাল। ওদের দেখে ছুটে এলো দাদা-দাদিসহ বাড়ির অন্যান্য লোকেরা। ওদের লাগেজপত্র ঘরে নেওয়া হলো।

গাড়ি থেকে নেমে বাড়ির ভিতরে ঢোকার সময় স্বপ্নীলের চোখ পড়লো রান্নাঘরের দিকে। রান্নাঘরে কাজ করছে একজন মধ্যবয়সী মহিলা। গায়ে মলিন শাড়ি, মাথার চুলগুলো উশকো-খুশকো। আর রান্নাঘরের দরজার সামনে বসে আছে ওরই বয়সি একটা ছেলে। রুক্ষ চুল, হাড্ডিসার দেহ। খালি গায়ে একটা বাচ্চাকে কোলে নিয়ে বসে আছে আর ওদের দিকে হা করে তাকিয়ে আছে। যাই হোক ওরা সবাই ঘরে গেল, হাত মুখ ধুয়ে বিশ্রাম নিল। এরপর ইফতারের সময় হলে সবাই মিলে একসাথে ইফতার করলো। রাতে ঘুমানোর আগে ওরা ঢাকা থেকে সবার জন্য যা যা জামা কাপড় এনেছিল সবারটা সবাইকে দিয়ে দিল।

পরেরদিন সকালে বাড়ির সব ছোটরা যারা রোজা রাখেনি তারা সবাই মিলে বাড়ির পিছনের আমবাগানে বনভোজনের আয়োজন করলো। বনভোজনের খাবার খেতে স্বপ্নীলের মা বারবার মানা করা সত্ত্বেও ও বনভোজনের রান্নার জায়গায় গেল, যদিও সেখানে ওর ভূমিকা ছিল শুধুই বসে থাকা। সেখানে বসে থাকতে থাকতেও ওর চোখ গেল আবারো রান্নাঘরের দিকে। আজও মহিলাটা কাজ করছে আর ছেলেটা রান্নাঘরের দরজার সামনে বোনকে কোলে নিয়ে বসে আছে। ওই মহিলাটা ওর দাদার বাড়ির কাজের লোক আর ছেলেটা ওই মহিলারই সেটাতো কালকে রাতেই জানা হয়ে গেছে। বিকালের দিকে বনভোজন শেষ হলো। কিন্তু বনভোজনের পুরোটা সময়ে স্বপ্নীলের চোখ ছিল ওই ছেলেটার দিকে। আজও ছেলেটা ওইরকম হা করে তাকিয়ে ছিল।

আজকে ইদের দিন। খুব সকালে ঘুম থেকে উঠে গোসল সেরে নতুন পাঞ্জাবি পরে সবাই রেডি ইদের নামাজের জন্য। সবাই মিলে ইদের নামাজ শেষ করে আসার সময় বাড়ির দক্ষিণ পাশে আবার দেখা মিললো ওই ছেলেটার। কি আশ্চর্য! আজও ছেলেটা ওইরকম খালিপায়েই বসে আছে। স্বপ্নীলের একবার মনে হলো ওর সাথে কথা বলা দরকার কিন্তু বাবা সাথে ছিল বলে যাওয়ার সাহস হলো না। এমন সময় একটা লোকের সাথে দেখা হলো। বাবা তার সাথে কথাবার্তায় মত্ত হয়ে গেছেন। এই সুযোগ। এর মধ্যেই কথা বলতে হবে ওর সাথে।

- আচ্ছা, তুমি আমাদের বাড়িতেই থাকো না?

- হ

- আজকে তো ইদের দিন। তুমি তাহলে নতুন জামা পরনি কেন আর তুমি নামাজ পড়তে যাওনি?

- না, আমার নতুন জামা নাই। আমার মায় যেই টাহা পাইছিল সেইডা দিয়ে নতুন জামা কেনতে পারি নাই। আমার বুইনের অসুখ তো। ওরে ডাক্তার দেহানোর জন্যে সেই টাহা শেষ হইয়া গেছে।

এমন সময় পিছন থেকে বাবা ডাক দিলেন। তাই আর কথা বলা হলো না। কিন্তু ছেলেটা ইদের দিনেও একটা নতুন জামা পেল না- বিষয়টা ওর মনে একটা খচখচানি সৃষ্টি করলো।

সকাল ১০টার দিকে বাড়ির সবাই এখন খুব ব্যস্ত। এই সুযোগে স্বপ্নীল নিজের ব্যাগ থেকে ইদে পাওয়া সাতটা জামা থেকে দুটো জামা নিয়ে চুপিসারে চলে গেল বাড়ির পিছনে আর জামা দুটো ওই ছেলেটাকে দিতে চাইলো। কিন্তু ছেলেটা কিছুতেই জামা দুটো নিতে রাজি হলো না

- না, এই জামা লেলে মায় আমারে মারবো।

দূর থেকে বিষয়টা দেখে ফেলেন স্বপ্নীলের মা। স্বপ্নীলকে ডাক দিয়ে নিয়ে গেলেন ঘরে। বিষয়টা বাবার কান পর্যন্ত পৌঁছে গেল।

- তুমি ওই ছেলেটাকে জামা দিতে গেছো কেন?

- ওর নাকি কোনো নতুন জামা নেই। আজকে ইদের দিনেও ও রাস্তার ধারে খালি গায়ে বসে ছিল। আমার তো সাতটা নতুন জামা। তাই আমি ওখান থেকে ওকে দুটো দিতে গেছিলাম।

- ছি! ছি! তুমি দেখেছো ওরা কোন পরিবেশের মানুষ? তুমি আমাকে বলতে পারতে, আমি কিছু টাকা দিয়ে দিতাম।

- কিন্তু এখন টাকা দিলেও নতুন জামা কি পাওয়া যাবে?

- তাই বলে... ওর সাথে এত গুজগুজানি করতে তোমার একটুও রুচিতে বাঁধল না?

- কিন্তু ওর তো কোনো নতুন জামা নেই। তাই আমি ওকে জামা দিতে গেছিলাম। স্কুলে আমাদের হুজুর স্যার বলেছে, আমাদের মহানবি (সাঃ) ঈদগাহ থেকে আসার সময় নিজের জামা খুলে দিয়ে এসেছিলেন একজনকে। আর তোমার অফিসের বক্তৃতার সময় তো তুমিই বলেছিলে যে, আমাদের বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান শীতের দিনে নিজের গায়ের চাদর খুলে এক বুড়ি মাকে দিয়ে এসেছিলেন। তারপর বৃষ্টির দিনে নিজের ছাতা দিয়ে এসেছিলেন অন্যজনকে। আর আমার তো সাতটা নতুন জামা আর ওর তো একটাও নেই। তাহলে আমার এখান থেকে দুটো জামা ওকে দিলে সমস্যা কী?

- তাই বলে...

এইটুকু বলার পর আর কোনো কথা খুঁজে পায় না বাবা। রেগে গিয়ে ঘর থেকে বের হয়ে যান।

ঐদিন অনেক রাত হয়ে গেল। কিন্তু বাবা এখনো ঘুমাতে গেলেন না। বরং বারবার পায়চারি করছিলেন আর কি যেন একটা ভাবছিলেন। মা বারবার ডেকে পাঠিয়েছেন কিন্তু ঘরে আসছিলেন না। বাবার মনে চলছিল এক অদৃশ্য ঝড়, বারবার মনে পড়ছিল সেই কথা- আমাদের বঙ্গবন্ধু যেখানে নিজের গায়ের চাদর খুলে অন্যকে দিয়েছিলেন, সেখানে আমরা যদি সাতটা জামা থেকে মাত্র দুটো দিয়ে অন্য কাউকে ইদের দিনে একটু খুশি করতে পারি তাহলে সমস্যা কী।

ইদের পরে দুই দিন কেটে গেছে। আজ স্বপ্নীলদের ঢাকা চলে যাওয়ার পালা। গতকাল রাতেই ওদের লাগেজপত্র গোছানো হয়ে গেছে। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই গাড়িতে করে ওরা আবার চলে যাবে। ওরা সবাই গাড়িতে উঠে গেলেও বাবাকে কোথাও দেখা যাচ্ছে না।

এদিকে বাবা ও দাদা রয়েছেন দাদার ঘরে। দাদার হাতে বাবা দশ হাজার টাকা দিয়ে বললেন, আমাদের বাড়ির ওই কাজের মহিলাটার মেয়েটা নাকি অসুস্থ। এই টাকাটা ওদেরকে দেবেন আর বলবেন মেয়েটাকে একটা ডাক্তার দেখাতে আর ওই যে ছেলেটা, ওকেও একটা স্কুলে ভর্তি করে দেবেন।

বাইরে অনেক ডাকাডাকির কারণে বাবা দ্রুত ঘর থেকে বেরিয়ে এসে গাড়িতে উঠলেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই গাড়ি ছেড়ে দিল। ছেলেটা আবারো হা করে গাড়ির পিছন দিকে তাকিয়ে থাকল, যেভাবে তাকিয়ে ছিল প্রথমদিন।

আকাশ ডাকে পাহাড়টাকে

সোমা মুৎসুদ্দী

আকাশ ডাকে পাহাড়টাকে
মেঘের দেশে আয়
বসতে দেবো আসন পেতে
মেঘের সাদা নায়।

ফুল ডাকে আয় পাখির ছানা
বাগান জুড়ে আয়
থাকবো দুজন মিলেমিশে
পরম মমতায়।

কৃষক ডাকে আয়রে খোকা
সবুজ শ্যামল গাঁয়
পুবের হাওয়া সর্ষেক্ষেতে
ঢেউ খেলিয়ে যায়।

ডাকাডাকির একটি ফাঁকেই
পেলাম নদীর দেখা
নদীর কাছেই ছলাৎ ছলাৎ
কলকলানি লেখা।

ছবি আঁকা

সব্যসাচী নজরুল

আপন মনে বসে খুকু
আঁকছে গাঁয়ের ছবি
ডান কোনেতে চাঁদ মামাটা
বাম কোনেতে রবি।
বিকেল হলে ছেলের দলে
মাঠে ওড়ায় ঘুড়ি
তেমন ঘুড়ি আঁকলো খুকু
পাশে চাঁদের বুড়ি।
আঁকছে দেখ নদীর ঘাটে
নৌকো দু'খান বাঁধা
ঘর দু'টোর উঠোন পাশেই
খড়ের বড় গাদা।
বাড়ির ধারে আঁকলো খুকু
ফসলেরও বাগান
যা দৃশ্যপটে ছড়ায় যেন
ফুলফলেদের ঘ্রাণ।
গাছগাছালি পাখপাখালি
আঁকলো কত কি
তবুও ভাবে আরো কিছু
বাকি রইল কি।

শৈশব

মো. তাইফুর রহমান

শৈশবে ভাই ছুটে যেতাম
ওইনা ফুলের বনে
থাকবে সদা মনে
আড্ডা দিতাম মন খুশিতে
বন্ধুদেরই সনে ।
ঘুরতাম আমি চারদিকে
টিকত কি মন ঘরে?
ভীষণ মনে পড়ে
স্মৃতিগুলো ভাসলে চোখে
মন বেদনায় ভরে।
খেলার মাঠের স্মৃতিগুলো
মনে রাখার মত
বলব এসব কত?
সোনালি সেই দিনের স্মৃতি
মনে জমা শত ।
শৈশব অনেক প্রিয় ছিল
যায় না ভাষায় বলা
স্বাধীন মত চলা
ফুলের মালা গাঁথতে সবে
যেতাম বকুলতলা।
হাজার স্মৃতি জমা থাকে
শৈশব সবার ঘিরে
আসবে কভু ফিরে?
নৌকা দেখতে ছুটে যেতাম
ওইনা নদীর তীরে।

মায়ের কাছে

কৃষ্ণ কর্মকার কৌশিক

আজকের তুমি জজ
ব্যারিস্টার
যতো বড়ই হও
কিন্তু তুমি মায়ের কাছে
মোটেই বড় নও।
বিরাট বড় শিল্পী তুমি
হরেক ছবি আঁক।
তবু তুমি মায়ের কাছে
ছোট হয়ে থাক।
রাস্তা দিয়ে হাঁটলে তুমি
সবাই সালাম হাঁকে
যে যা বলুক-
মা-যে তোমায়
খোকা বলেই ডাকে।

ছবি: শাহিমা রহমান প্রেয়া
তিকারুননিসা নূন স্কুল, বেইলি রোড, ঢাকা

আমগাছ আর ফইচুন্নি ভূত

জুয়েল আশরাফ

উনাইসার দাদি আরামে আরামকেদারায় বসে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন আম গাছটার দিকে। গত মাসেও কচি কচি লালচে পাতা প্রতিটি ডালের মাথায় মাথায় ছিল। মুকুল ধরেছিল অনেক। দেখেই অনুমান করা গেছে, এ বছরও ফল হবে, তারই আভাস দেখা যাচ্ছে। খুব মিষ্টি আম হয় এ গাছে। এখন আমের ভরা মৌসুম। আমগাছটার প্রতি অসম্ভব মায়া উনাইসার দাদির। শুধু স্কুলের ছেলেমেয়েগুলোর উপর ক্ষোভ আর দুঃখ, মাঝে মাঝেই দামাল ছেলেগুলোর উপর ফুঁসে ওঠেন। কী ভেবে দাদি বাইরে বেরিয়ে আসতে আসতে হাঁক-ডাক করলেন, আরে ও উনাইসা, দেখো, তুমি বাইরে উঠানে এসে এই গেটটা বন্ধ করে দাও। এখন স্কুলে টিফিনের সময় হবে, স্কুলের দুষ্টু ছেলেমেয়েরা নিশ্চয়ই আমার এই ছোট আমগাছে পাথর ছুঁড়ে ঘরের জানালার কাঁচ ভেঙে দেবে।

গেট থেকে বেরিয়ে যাওয়ার আগে দাদি আরও বললেন, আমি না আসা পর্যন্ত তুমি এখানে দাঁড়াও, নাহলে বাইরে লাল গরুটা ভেতরে এসে আমার সব ফুলের টব ভেঙে ফেলবে। আমি স্কুলে গিয়ে দুষ্টু ছেলেমেয়েদের নামে নালিশ করবো আজ। আমার আমগাছের ডাল নেতিয়ে পড়েছে। আমি নার্সারি থেকে বিভিন্ন ধরনের আমগাছ আর ফুলগাছ কিনেছি। স্কুলের দুষ্টু ছেলেমেয়ের দল আমাকে দুশ্চিন্তায় রাখে রোজ।

বিড়বিড় করতে করতে দাদি গেটের শেষে পৌঁছালেন। উনাইসা ঘর থেকে বেরিয়ে এলো উঠানে। তাকে উঠানে আসতে দেখে দাদি হাঁটার গতি কমিয়ে দিলেন। তারপর উনাইসার দিকে তাকিয়ে হাসতে হাসতে চলে গেলেন। উনাইসা উঠানের গেট বন্ধ করে আম চুরির চিন্তায় মগ্ন হয়ে পড়ে।

উহু! এই দেখ ফেব্রুয়ারি মাসের কথা, উনাইসার বাগান ফুলে ফুলে ভরাট ছিল। মনে পড়ল, ফাজিল ছেলেমেয়েগুলো ফুল ছিঁড়ছিল আর উনাইসা তাদের বকাঝকা করতে দৌড়াচ্ছিল।

দাদি ও নাতিন কখনই বুঝতে পারে না যে, দূরে দাঁড়িয়ে একটি আমগাছ রোজ তাদের দেখে আর ভাবে। তাদের লাগানো একটি ছোট আমগাছ। দুষ্টু ছেলেমেয়েদের ঢিল খেয়ে খেয়ে বড় হয়েছে, তারা আম চায়। দাদি নাতিন অন্যদের আম দিতে চায় না। ওরা কি জানে আমগাছেরও আবেগ আছে। গাছের আম গাছ খায় না, কিন্তু কাউকে খেতে দেখে তার খুব ভালো লাগে।

ভবঘুরে, গরুর তার ছায়ায় বসে থাকা, এসব পাখির বাসা তার হৃদয়। সে সেই স্কুলের ছেলেপুলেদেরও পছন্দ করে যারা তার ডাল ভাঙার জন্য তাকে পাথর ছুঁড়ে মেরেছে। বেচারি উনাইসা তাকে বাঁচাতে আসে, কিন্তু বাকিরা সবাই তাকে বন্ধুত্ব এনে দেয়। একথা উনাইসা জানে না।

সেদিন লাল গরুকে আসতে দেখে আমগাছ খুব খুশি হলো। কাছে আসতেই বলল, হ্যালো হাথা মামা। আজ এত দেরি করলে কেমন করে? সকাল থেকে তোমার জন্য অপেক্ষা করতে লাগলাম, তোমাকে নিয়ে কত কিছু করতে হবে। তুমি জানো সামনের স্কুলের এই ছেলেমেয়েরা আমার ছোট্ট ক্ষতকে জ্বালিয়ে বড় করে তুলেছে। তাদের অজ্ঞতার কারণে এত ফুল ঝরে পড়ে। ফুল থেকে নিজেই ফল তৈরি হবে আর মিষ্টি-মিষ্টি আমও তৈরি হবে, কিন্তু কে বোঝাবে? এখন এখানে এসে বসো। স্কুলের ঘন্টা বাজলে সবাই এখানে আসবে।

আমগাছ লাল গরুকে বলে মনটা শান্ত করল। ধীর বাতাসে দমকা খেতে লাগল। লাল গরু হেসে বলল, আম্র ভাইপনা, তোমাকে স্থির থাকতে হবে কিন্তু আমি তোমাকে ছেড়ে দিতে বলব না। তোমার মালি কোথায় গেছে? সবাই তাকে উনাইসা বলে ডাকে। এখন স্কুলের ছেলেমেয়েরা আসতেই তারাও এখানে আসবে এই ছোট পাছগুলো বাঁচাতে। আমার শিং দেখিয়ে ওই ছেলেমেয়েদের ভয় দেখাতে হবে না, উনাইসা বকাঝকা করে সবাইকে তাড়িয়ে দেবে।

বসো, তোমাকে অনেক কথা বলার আছে। ওহ সে চড়ুই রানি, যে সকাল থেকেই কিচিরমিচির করে, সে চারটি ডিম দিয়েছে। আমি আর ময়না কত ভাবছিলাম যে এখন এটা হবে, এখন ওটা হবে... তাই হয়েছে।

লাল গরু বলল, আচ্ছা, সে আমাকে জানায়নি। তুমি ডিম নিয়ে চিন্তা করো না, দুটিই কিচিরমিচির পাখি, ওরা খুব পরিশ্রমী।

ঠিক তখনই দূর থেকে চড়ুই রানিকে আসতে দেখা গেল, তাড়াতাড়ি এসে ডালে বসল। রানি তার ডিমের উপর বসে বলল, দেখ হাথা মামা, তোমার কাছে আসেনি। এখনও ঠান্ডা হয়নি। এরা কি বলে হ্যাঁ মধুমাস। ওহ আল্লাহ, চিন্তা করবে না। স্কুলের ছেলেমেয়েদেরও গ্রীষ্মের ছুটি হবে।

আমগাছ আরও ভাবে, সে এই সঙ্গীদের সাথে সারাদিন কাটায়, সন্ধ্যায় যখন পাখিরা তার উপর তৈরি বাসাগুলোতে ফিরে আসে, সে শান্তিতে ঘুমাতে পারে।

গত বছর সকাল থেকে রাস্তার জনশূন্যতা দেখে একটু চিন্তিত হয়েছিল আমগাছ। সে রানিকে বলল, আরে! আজ আর কোনো ছেলেমেয়েকে দেখা যাচ্ছে না কেন?

রানির ডিম থেকে বাচ্চাগুলো বের হয়ে উড়তে শিখছিল। চড়ুই রানি বলল, আম্র ভাই, তুমি জানো না, এখন স্কুল ছুটি যাচ্ছে। স্কুলের ছেলেমেয়েরা এখন তোমাকে কষ্ট দিতে আসবে না। এখন তোমার এই ডালের পাতাগুলো উজ্জ্বল হয়ে উঠবে।

চড়ুই রানির কণ্ঠে বিষাদ। সে তাকাতে লাগলো বন্ধ স্কুলের দরজার দিকে। মাত্র কয়েকটা দিন কেটেছে, কিন্তু আমগাছের কাছে এই দিনগুলো শতবর্ষের মতো মনে হয়েছে। সে যখন এখানে দাঁড়িয়ে দূরে তাকায়, কেবল এই নির্জন রাস্তা দেখতে পায়। সেও মানুষ ছাড়া দিন কাটাতে শিখেছে। অনেকদিন পর আজ এক অচেনা পথিক তার নিচে কিছুক্ষণ ঘুমিয়ে চলে গেল।

আজ রাতে প্রবল বাতাস বইছে। আমগাছ ভাবলো, রাস্তায় কেউ আসছে। আমগাছ বলল, তুমি কে?

তীব্র কণ্ঠে জবাব এলো, আমি ফইচুন্নি। আমি তোমার এই বাড়িতে আসব।

ফইচুন্নি! আমি তোমার শক্তিশালী হওয়ার অনেক গল্প শুনেছি।

আমগাছ কেঁপে উঠলে কিছু পাতাও কেঁপে ওঠে। দু-চারটি পাতাও পড়ে যায় ভয়ে।

হ্যাঁ, আমিই সেই যে এই পৃথিবীর ছেলেমেয়েদের বুক কাঁপিয়ে দিয়েছি।

ফইচুন্নির অহংকার স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। আমগাছ তার দিকে তাকাল। বলল, তুমি কি পশু-পাখিকেও ভয় দেখিয়ে ছাড়ো?

ফইচুন্নি বলল, তুমিও কি আমাকে ভয় পাচ্ছো? তবে আমি বাড়ির লোকের জন্য এসেছি। উনাইসার জন্য এসেছি।

ফইচুন্নি! সাহস থাকলে আমাকে ভয় দেখাও...।

আমগাছ কিছু একটা ভেবে উনাইসার ঘরের দিকে তাকাল।

ফইচুন্নি রেগে আমগাছ ছুঁয়ে হাসতে লাগল। তারপর আমগাছ বাতাসকে বলল, হে বাতাস, তুমি আজ আমাকে সাহায্য করো। আমি তোমার কাছে ঋণী। তুমি আমাকে, আমার আম আর আমার উপর বানানো এই পাখিদের বাসা বাঁচাতে আমাকে সবসময় সাহায্য করেছো। আজও...।

বলতে বলতে আমগাছের গলা ভরে গেল। তারপর প্রবল বাতাস বইতে লাগল। আমগাছ ঘুমন্ত পাখিদের বাসা থেকে জাগিয়ে তাড়িয়ে দিল। এখন সে নিজেকে ছেড়ে দিয়ে মাটি থেকে শিকড় নাড়াতে সাহস পাচ্ছে।

আহ! প্রচণ্ড ব্যথা হচ্ছে। কিন্তু আমগাছ অবশেষে তার ডাল, পাতা আর ফইচুন্নির সাথে পড়ে গেল।

সকালে উনাইসার দাদি বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসার সাথে সাথে একটি আমগাছ রাস্তায় পড়ে থাকতে দেখে কেঁদে ফেললেন। গাছটি তুলতে লোকজনকে ডাকেন। এবার নাতিনকে বললেন, উনাইসা, হঠাৎ এমন ফলভর্তি একটি গাছ পড়ে গেল। সাবধান, কেউ কেউ রাস্তা থেকে এই গাছের আম তুলে বাড়িতে নিয়ে যাচ্ছে।

কর্মচারীরা এসে আমগাছ কেটে ট্রাকে করে নিয়ে গেল। উনাইসা প্রতিবেশী বাড়ির জানালা দিয়ে ট্রাকে পড়ে থাকা আমগাছের ডাল দেখতে লাগল। তাদের বাড়ির মাটি থেকে হঠাৎ করে একটি সবুজ আমগাছ উপড়ে পড়ার ঘটনাটি এলাকায় আলোচনার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। আর এখানে ট্রাকে আমগাছ কাটা দেখে দূরে দাঁড়িয়ে থাকা লাল গরুটাও কেঁদে উঠল। একঝাঁক পাখি ছাদে বসে এসব দেখছে।

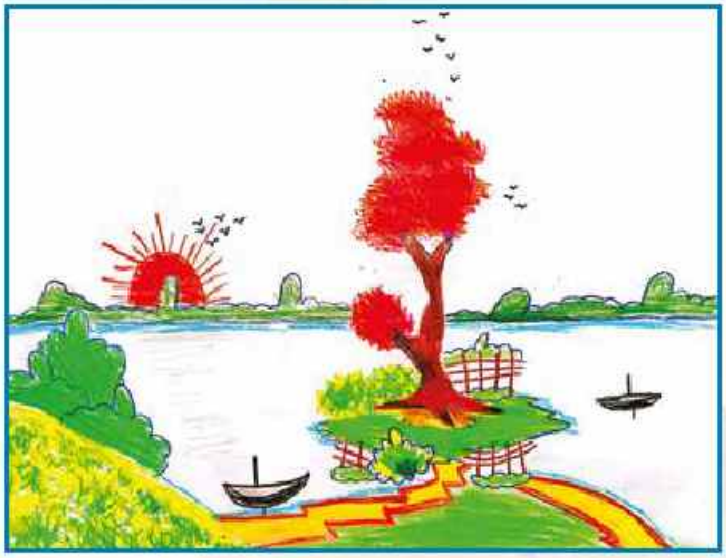

ছবি: সুহানা জাবিন, ২য় শ্রেণি, রোল নং: ৬
৮১নং খুমুরিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়
খুমুরিয়া, পিরোজপুর

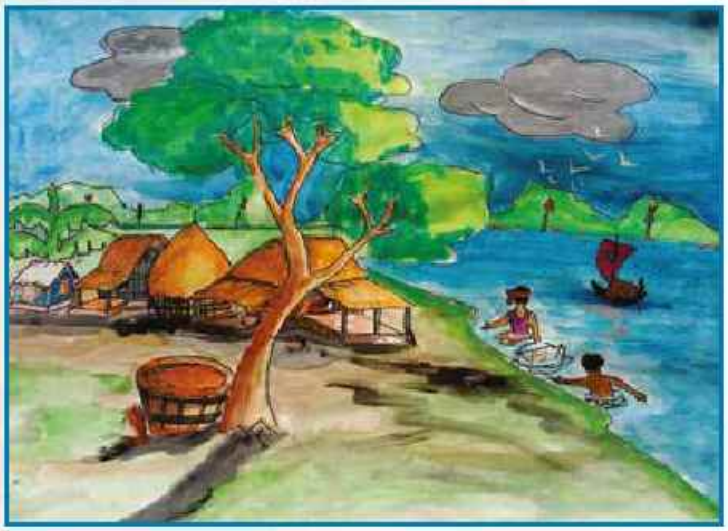

ছবি: নুসরাত জাহান বিভা, ৬ষ্ঠ শ্রেণি
কল্যাণপুর মৌজুদাল হক প্রাথমিক বিদ্যালয়
আশাশুনি, সাতক্ষীরা

ছবি: সংগৃহীত

গ্রীষ্মকালীন নির্দিষ্ট অনুষ্ঠান সূচি

১ এপ্রিল ২০২৩ থেকে ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৩ ● ১৮ চৈত্র ১৪২৯ থেকে ১৫ আশ্বিন ১৪৩০

বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা

ঢাকা-খ: মধ্যম তরঙ্গ ৮১৯ কিলোহার্জ ও এফ এম ১০০ মেগাহার্জ

সময়	অনুষ্ঠান	স্থিতি	প্রচার দিন	কেন্দ্র
রাত/নিশুতি অধিবেশন				
১১-৫৭	সূচকধ্বনি ও উদ্বোধনী ঘোষণা	০৩ মি.	প্রতিদিন	ঢাকা-খ ও একএম ১০০ মেগাহার্জ থেকে প্রচার
১২-০০	বাংলা সংবাদ	০৫ মি.	প্রতিদিন	ঢা
১২-০৫	ইংরেজি সংবাদ	০৫ মি.	প্রতিদিন	ঢা
১২-১০	দেশাত্মবোধক গান	০৫ মি.	প্রতিদিন	ঢা
১২-১৫	নাটক	৬০ মি.	প্রতিদিন	ঢা
১-১৫	বর্ণালি: আধুনিক গানের অনুষ্ঠান	২৫ মি.	প্রতিদিন	ঢা
১-৪০	ক. সেরা গল্প:প্রখ্যাত সাহিত্যিকদের গল্প নিয়ে অনুষ্ঠান	১৫ মি.	প্রতি শুক্রবার	ঢা
	খ. সেই আমি এই আমি: গান, নাটক, চলচ্চিত্র, সাহিত্য প্রভৃতি অঙ্গনের প্রখ্যাত ব্যক্তিদের স্মৃতিচারণমূলক অনুষ্ঠান	১৫ মি.	প্রতি বুধবার	ঢা
	গ. মন ছুটে যায়: ভ্রমণ ও পর্যটন বিষয়ক অনুষ্ঠান	২০ মি.	প্রতি বৃহস্পতিবার	ঢা
	ঘ. রঙধনু: মিশ্র গানের অনুষ্ঠান	২০ মি.	প্রতি শনি, রবি, সোম ও মঙ্গল	ঢা
১-৫৫	বন্ধবন্ধুকে নিবেদিত গান	০৫ মি.	প্রতি বুধ ও শুক্রবার	ঢা
২-০০	ক. আকাশভরা সুরের ধারা: দেশ-বিদেশের রকমারি গান	৫৫ মি.	রবি, সোম, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি ও শুক্রবার	ঢা
	খ. আলোর পথে যাত্রা: মাদকবিরোধী ক্যাপাঞ্জিন অনুষ্ঠান	৩০ মি.	শনিবার	ঢা
২-৩০	আকাশভরা সুরের ধারা: দেশ-বিদেশের রকমারি গান	২৫ মি.	শনিবার	ঢা
২-৫৫	আবহাওয়াবার্তা (অভ্যন্তরীণ নদীবন্দরগুলোর জন্য) ও দিনের অনুষ্ঠান পরিচিতি	০৫ মি.	প্রতিদিন	ঢা
৩-০০	সমাপ্তি			ঢা

সময়	অনুষ্ঠান	স্থিতি	প্রচার দিন	কেন্দ্র
	ঢাকা-ক ও খ: মধ্যম তরঙ্গ ৬৯৩ ও ৮১৯ কিলোহার্জ এবং এফএম ১০৬ মেগাহার্জ			
সকাল				
৫-৫৭	সূচকধ্বনি	০২ মি.	প্রতিদিন	ঢাকা-ক, খ ও এফএম ১০৬ মেগাহার্জ থেকে প্রচার
৫-৫৯	উদ্বোধনী ঘোষণা	০১ মি.	প্রতিদিন	ঐ
৬-০০	ক. পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত			
	খ. তরজমা			
	গ. পথ ও পাথেয়			
	ঘ. হামদ/নাত	১৫ মি.	প্রতিদিন	সকল কেন্দ্র এবং ঢাকা-ক, খ ও এফএম ১০৬ মেগাহার্জ থেকে প্রচার
৬-১৫	ক. বাংলা অনুবাদসহ পবিত্র গীতা পাঠ	০৫ মি.	শনি, সোম ও বুধবার	ঐ
	খ. বাংলা অনুবাদসহ পবিত্র ত্রিপিটক পাঠ	০৫ মি.	মঙ্গল ও বৃহস্পতিবার	ঐ
	গ. বাংলা অনুবাদসহ পবিত্র বাইবেল পাঠ	০৫ মি.	রবিবার	ঐ
	ঘ. দেশাত্মবোধক গান	০৫ মি.	শুক্রবার	ঐ
৬-২০	আবহাওয়া বার্তা	০২ মি.	প্রতিদিন	ঐ
৬-২২	অনুষ্ঠান পরিচিতি ও দিনের বিশেষ বেতার অনুষ্ঠানের প্রমো	০৩ মি.	প্রতিদিন	ঢাকা-ক, খ ও এফএম ১০৬ মেগাহার্জ থেকে প্রচার
৬-২৫	ভোরের গান	০৫ মি.	প্রতিদিন	ঐ
৬-৩০	নজরুল সংগীত	১০ মি.	প্রতিদিন	ঐ
৬-৪০	রবীন্দ্র সংগীত	১০ মি.	প্রতিদিন	ঐ
৬-৫০	কৃষি সমাচার (কৃষি বিষয়ক কার্যক্রম কর্তৃক প্রযোজিত অনুষ্ঠান)	১০ মি.	প্রতিদিন	ঐ
৭-০০	বাংলা সংবাদ	২০ মি.	প্রতিদিন	সকল কেন্দ্র এবং ঢাকা-ক, খ ও এফএম ১০৬ মেগাহার্জ থেকে প্রচার
৭-২০	সুখের ঠিকানা: (জনসংখ্যা,স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সেল কর্তৃক প্রযোজিত অনুষ্ঠান)	১০ মি.	প্রতিদিন	ঐ
	ঢাকা-ক: মধ্যম তরঙ্গ ৬৯৩ কিলোহার্জ এবং এফএম ১০৬ মেগাহার্জ			
সকাল				
৭-৩০	ক. শেখ হাসিনার বিশেষ উদ্যোগ: সরকারের উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের উপর ভিত্তি করে ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান	১৫ মি.	শনিবার	সকল কেন্দ্র এবং ঢাকা-ক ও এফএম ১০৬ মেগাহার্জ থেকে প্রচার
			বুধবার	ঢাকা-ক ও এফএম ১০৬ মেগাহার্জ থেকে প্রচার
	খ. বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ: বঙ্গবন্ধুর জীবনকর্ম ও বাংলাদেশ নিয়ে অনুষ্ঠান	১৫ মি.	১ম, ৩য় ও ৫ম শুক্রবার	সকল কেন্দ্র এবং ঢাকা-ক ও এফএম ১০৬ মেগাহার্জ থেকে প্রচার
	গ. রবীন্দ্র সংগীতের অনুষ্ঠান	১৫ মি.	২য় শুক্রবার	ঢাকা-ক ও এফএম ১০৬ মেগাহার্জ থেকে প্রচার
	ঘ. নজরুল সংগীতের অনুষ্ঠান	১৫ মি.	৪র্থ শুক্রবার	ঐ
	ঙ. টেকসই উন্নয়নে বাংলাদেশ: এসডিজি বিষয়ক উন্নয়নমূলক অনুষ্ঠান	১৫ মি.	প্রতি বৃহস্পতিবার	ঐ
	চ. বিবেকের জাগরণ: সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদবিরোধী জনসচেতনতামূলক অনুষ্ঠান	১০ মি.	প্রতি রবিবার	ঐ
	ছ. আমার বাংলাভাষা: শুদ্ধ বাংলা ভাষাচর্চা বিষয়ক অনুষ্ঠান	১০ মি.	প্রতি সোমবার	ঐ
	জ. মনে মুক্তিযুদ্ধ: মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান	১৫ মি.	মঙ্গলবার (৪র্থ মঙ্গল বাদে)	ঐ
	ঝ. ইতিহাস কথা কয়: স্বাধীনবাংলা বেতার কেন্দ্রের ইতিহাস ও অনুষ্ঠানমালা নিয়ে প্রচারিত অনুষ্ঠান	১৫ মি.	৪র্থ মঙ্গলবার	ঐ
৭-৪০	ক. বজ্রকণ্ঠ: বঙ্গবন্ধুর কালজয়ী ভাষণ নিয়ে বিশ্লেষণধর্মী আলোচনা	১০ মি.	১ম ও ৩য় রবিবার	ঐ
	খ. সংগীত	১০ মি.	২য়, ৪র্থ, ৫ম রবি ও প্রতি সোম	ঐ

সময়	অনুষ্ঠান	স্থিতি	প্রচার দিন	কেন্দ্র
৭-৪৫	ক. দুর্নীতির বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স বিষয়ক বার্তা	০৫ মি.	শুক্রবার	ঐ
	খ. দেশাত্মবোধক গান	০৫ মি.	মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি ও শনিবার	ঐ
৭-৫০	সংগীত	১০ মি.	প্রতিদিন	ঐ
৮-০০	ইংরেজি সংবাদ	১০ মি.	প্রতিদিন	সকল কেন্দ্র এবং ঢাকা-ক ও এফএম ১০৬ মেগাহার্জ থেকে প্রচার
৮-১০	ক. এ সপ্তাহের গান	০৫ মি.	শুক্রবার	ঢাকা-ক ও এফএম ১০৬ মেগাহার্জ থেকে প্রচার
	খ. বঙ্গবন্ধুর অমর কথা: বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান রচিত গ্রন্থ থেকে পাঠ	০৫ মি.	রবি, সোম ও মঙ্গলবার	ঐ
	গ. দেশাত্মবোধক গান	০৫ মি.	বুধ, বৃহস্পতি ও শনিবার	ঐ
৮-১৫	ক. সেরা গল্প: প্রখ্যাত সাহিত্যিকদের গল্প নিয়ে অনুষ্ঠান/মাসব্যাপী বিশেষ অনুষ্ঠান	১৫ মি.	বৃহস্পতিবার	ঐ
	খ. সেই আমি এই আমি: গান, নাটক, চলচ্চিত্র, সাহিত্য প্রভৃতি অঙ্গনের প্রখ্যাত ব্যক্তিদের স্মৃতিচারণমূলক অনুষ্ঠান/মাসব্যাপী বিশেষ অনুষ্ঠান	১৫ মি.	মঙ্গলবার	ঐ
	গ. ভক্তিমূলক মঙ্গলগান সংগীত/মাসব্যাপী বিশেষ অনুষ্ঠান	১৫ মি.	রবি, বুধ ও শুক্রবার	ঐ
	ঘ. মাসব্যাপী বিশেষ অনুষ্ঠান	১৫ মি.	সোমবার	ঐ
	ঙ. সংগীত (মাসব্যাপী বিশেষ অনুষ্ঠান না থাকলে)	১০ মি.	সোমবার	ঐ
	চ. আমাদের বঙ্গবন্ধু: বিভিন্ন জেলায় বঙ্গবন্ধুর স্মৃতি বিজড়িত বিভিন্ন ঘটনা ও স্থান নিয়ে অনুষ্ঠান	১০ মি.	শনিবার	ঐ
৮-২৫	বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত গান	০৫ মি.	শনিবার	ঐ
	বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত গান (মাসব্যাপী বিশেষ অনুষ্ঠান না থাকলে)	০৫ মি.	সোমবার	ঐ
৮-৩০	ক. দর্পণ: জাতীয় ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান	৩০ মি.	প্রতিদিন (শুক্রবার ব্যতীত)	ঐ
	খ. ধরিত্রী কথা: জলবায়ু-পরিবেশ ও বিজ্ঞান-প্রযুক্তি বিষয়ক ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান	২৫ মি.	প্রতি শুক্রবার	ঐ
৮-৫৫	উন্নয়নমূলক গান	০৫ মি.	প্রতি শুক্রবার	ঐ
৯-০০	বাংলা সংবাদ	০৫ মি.	প্রতিদিন	সকল কেন্দ্র এবং ঢাকা-ক ও এফএম ১০৬ মেগাহার্জ থেকে প্রচার
৯-০৫	ক. কলকাকলি: শিশু-কিশোরদের জন্য ম্যাগাজিনঅনুষ্ঠান	৫৫ মি.	শুক্রবার	ঢাকা-ক ও এফএম ১০৬ মেগাহার্জ থেকে প্রচার
	খ. সংগীত	৩০ মি.	১ম, ৩য় ও ৫ম মঙ্গল, বৃহস্পতি ও শনিবার	ঐ
	গ. বয়সে রতন মেলে: নারী ও শিশু উন্নয়নে বাণাযোগ কার্যক্রম প্রবোজিত ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান	১৫ মি.	২য় ও ৪র্থ মঙ্গলবার	ঐ
	ঘ. গানের আসর: শ্রোতাদের ভোটে নির্বাচিত শ্রেষ্ঠ গানের গ্রন্থিত অনুষ্ঠান	৩০ মি.	রবি ও সোমবার	ঐ
	ঙ. মন ছুটে যায়: ভ্রমণ ও পর্যটন বিষয়ক অনুষ্ঠান	২০ মি.	বুধবার	ঐ
	চ. সুরের ভুবন: শিল্পী/গীতিকার/সুরকারের জীবনভিত্তিক সাক্ষাৎকারমূলক অনুষ্ঠান	৩০ মি.	২য় ও ৪র্থ শনিবার	ঐ
	ছ. সংগীত	৩০ মি.	১ম, ৩য় ও ৫ম শনিবার	ঐ
৯-২০	পল্লিকবির গান	১৫ মি.	২য় ও ৪র্থ মঙ্গলবার	ঐ
৯-২৫	সংগীত	১০ মি.	বুধবার	ঐ
৯-৩৫	ক. সংগীত	১০ মি.	শনি ও রবিবার	ঐ
	খ. অগ্রযাত্রা: বাংলাদেশের উন্নয়ন নিয়ে প্রচারণামূলক অনুষ্ঠান	২৫ মি.	বৃহস্পতিবার	ঐ
	গ. ইসলামের প্রচার ও প্রসারে শেখ হাসিনার সরকার	১৫ মি.	মঙ্গলবার	ঐ
	ঘ. চলমান মাইক্রোফোন: স্পট রিপোর্টিং	১০ মি.	বুধবার	ঐ
	ঙ. সংগীত	২০ মি.	সোমবার	ঐ
৯-৪৫	ক. শিশুতোষ নাটক	১৫ মি.	শনিবার	ঐ
	খ. সংগীত	১০ মি.	রবি ও বুধবার	ঐ
৯-৫০	সংগীত	১০ মি.	মঙ্গলবার	ঐ
৯-৫৫	দেশাত্মবোধক গান/জনকল্যাণমূলক বার্তা/স্পট/স্লোগান	০৫ মি.	রবি, সোম ও বুধবার	ঐ

সময়	অনুষ্ঠান	স্থিতি	প্রচার দিন	কেন্দ্র
১০-০০	বাংলা সংবাদ	০৫ মি.	প্রতিদিন	সকল কেন্দ্র এবং ঢাকা-ক ও এফএম ১০৬ মেগাহার্জ থেকে প্রচার
১০-০৫	ক. সংগীত/ লঘুসুরে যন্ত্রসংগীত	১০ মি.	প্রতিদিন (জুমবার ব্যতীত)	ঢাকা-ক ও এফএম ১০৬ মেগাহার্জ থেকে প্রচার
	খ. মীনা ফোনো-লাইভ অনুষ্ঠান	৫৫ মি.	প্রতি জুমবার	ঐ
১০-১৫	দেশাত্মবোধক গান	০৫ মি.	প্রতিদিন (জুমবার ব্যতীত)	ঐ
১০-২০	ক. সংগীত/স্মরণে-বরণে: প্রখ্যাত গীতিকার, সুরকার ও শিল্পীদের মৃত্যুদিন/জন্মদিন নিয়ে বিশেষ অনুষ্ঠান	৪০ মি.	প্রতিদিন (জুম ও শনিবার ব্যতীত)	ঐ
	খ. অহংকারের স্বদেশ: মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক গান, স্বাধীনবাংলা বেতার কেন্দ্রের গান ও দেশাত্মবোধক গান নিয়ে গ্রন্থিত অনুষ্ঠান	৩০ মি.	প্রতি শনিবার	ঐ
১০-৫০	সংগীত	১০ মি.	প্রতি শনিবার	ঐ
বেলা				
১১-০০	বাংলা সংবাদ	০৫ মি.	প্রতিদিন	সকল কেন্দ্র এবং ঢাকা-ক ও এফএম ১০৬ মেগাহার্জ থেকে প্রচার
১১-০৫	ক. সাপ্তাহিক পরিক্রমা	১০ মি.	প্রতি জুমবার	ঢাকা-ক ও এফএম ১০৬ মেগাহার্জ থেকে প্রচার
	খ. ঐকতান: গোষ্ঠীভিত্তিক অনুষ্ঠান	২৫ মি.	১ম, ৩য় ও ৫ম শনিবার	ঐ
	গ. অগ্নিবীণায় মুক্ত স্বদেশ: মুক্তিযুদ্ধ ও বঙ্গবন্ধুর আদর্শ নিয়ে গোষ্ঠীভিত্তিক অনুষ্ঠান	২৫ মি.	২য় ও ৪র্থ শনিবার	ঐ
	ঘ. তারুণ্যের শক্তি বাংলাদেশের সমৃদ্ধি: তরুণদের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠান	২৫ মি.	২য় ও ৪র্থ রবিবার	ঐ
	ঙ. প্রজন্মকণ্ঠ: নতুন প্রজন্মের অংশগ্রহণে ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান	২৫ মি.	প্রতি মঙ্গলবার	ঐ
	চ. সেতু: শ্রোতাক্লাবভিত্তিক ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান	২৫ মি.	১ম বুধবার	ঐ
	ছ. দৃপ্ত শপথ: বিএনসিসি'র অনুষ্ঠান	২৫ মি.	৩য় বুধবার	ঐ
	জ. সংগীত	২০ মি.	১ম, ৩য়, ৫ম রবি, সোম ২য়, ৪র্থ, ৫ম বুধবার ও বৃহস্পতিবার	ঐ
১১-১৫	বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত গান	০৫ মি.	প্রতি জুমবার	ঐ
১১-২০	নারীকণ্ঠ : নারীদের জন্য ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান	৩০ মি.	প্রতি জুমবার	ঐ
১১-২৫	দেশাত্মবোধক গান	০৫ মি.	১ম, ৩য়, ৫ম রবি, সোম ২য়, ৪র্থ, ৫ম বুধবার ও বৃহস্পতিবার	ঐ
১১-৩০	স্বাস্থ্যই সুখের মূল: (জনসংখ্যা, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সেল কর্তৃক প্রযোজিত অনুষ্ঠান)	৩০ মি.	প্রতিদিন (জুম ব্যতীত)	ঐ
১১-৫০	ভক্তিমূলক গান	১০ মি.	প্রতি জুমবার	ঐ
দুপুর				
১২-০০	বাংলা সংবাদ	০৫ মি.	প্রতিদিন	ঐ
১২-০৫	আবহাওয়াবার্তা	০৫ মি.	প্রতিদিন	ঐ
১২-১০	ঢাকা-ক এর বিরতি	–	–	–
	ঢাকা-ক: মধ্যম তরঙ্গ ৬৯৩ কিলোহার্জ এবং এফএম ১০৬ মেগাহার্জ			
বেলা				
২-১২	সূচকধ্বনি	০২ মি.	প্রতিদিন	ঢাকা-ক ও এফএম ১০৬ মেগাহার্জ থেকে প্রচার
২-১৪	উদ্বোধনী ঘোষণা	০১ মি.	প্রতিদিন	ঐ
২-১৫	অনুষ্ঠান পরিচিতি/হাইলাইটস/আবহাওয়াবার্তা/ যন্ত্রসংগীত/জনকল্যাণমূলক স্পট/স্লোগান	০৫ মি.	প্রতিদিন	ঐ
২-২০	ক. স্মার্ট বাংলাদেশ: ফোন-ইন অনুষ্ঠান	৪০ মি.	২য় ও ৪র্থ রবিবার	ঐ
	খ. ভিশন-২০৪১: স্মার্ট বাংলাদেশ (আলোচনা অনুষ্ঠান)	২০ মি.	১ম ও ৩য় রবিবার	ঐ
	গ. সংগীত	৪০ মি.	৫ম রবি, ১ম বৃহস্পতি ও ১ম, ৩য়, ৫ম জুমবার	ঐ